দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

রামজন্মভূমি :
ফিনিক্স পাখির মতোই
ডানা মেলল প্রকৃত
ইতিহাস
পৃঃ —১৩

রামজন্মভূমি মামলার রায়
এবং কতিপয় বিশিষ্ট
ব্যক্তির মত
পৃঃ —২৭

৭২ বর্ষ, ১২ সংখ্যা।। ২৫ নভেম্বর ২০১৯।। ৮ অগ্রহায়ণ - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com

প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ

বিচারপতি এস এ বোবডে

বিচারপতি ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়

রাম জন্মস্থানেই রামমন্দির

বিচারপতি অশোক ভূষণ

বিচারপতি এস আব্দুল নজির

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ১২ সংখ্যা, ৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

২৫ নভেম্বর - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

রেখেছ কমিউনিস্ট করে মানুষ করোনি ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ৬

খোলা চিঠি : দিদিকে বলে লাভ নেই ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

অযোধ্যা মামলায় সর্বোচ্চ আদালতের যুগান্তকারী রায়দান ▯ রবিশঙ্কর প্রসাদ ▯ ৮

ভারতবাসীর অস্মিতা বিজেপিই বুঝেছিল ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ১১

রামজন্মভূমি : ফিনিক্স পাখির মতোই ডানা মেলল প্রকৃত ইতিহাস ▯ সুজিত রায় ▯ ১৩

ভারতীয় ও বঙ্গীয় সংস্কৃতিতে শ্রীরামচন্দ্র স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ▯ অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১৫

জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত আধুনিক ভারতের নতুন প্রজন্ম দেশদ্রোহীদের ক্ষমা করবে না ▯ ১৭

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ দেবের ভক্তদের আজ বড়ো সুখের দিন ▯ সারদা সরকার ▯ ১৯

মাটির নীচে হিন্দু স্থাপত্য ওপরে বাবরের জবরদখল ▯ চন্দ্রভানু ঘোষাল ▯ ২১

ভারতীয় সভ্যতার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করার পথ চলা শুরু ▯ সোমনাথ গোস্বামী ▯ ২৩

ভারতবর্ষের আদি ও আদর্শ রাষ্ট্রপুরুষ শ্রীরামচন্দ্র ▯ বিজয় আঢ্য ▯ ২৪

রামজন্মভূমি মামলার রায় এবং কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির মত ▯ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ▯ ২৭

গ্রাম বাঙ্গলায় গো-মাতা পুজো ▯ শৌভিক রাতুল বসু ▯ ৩১

শতবর্ষের আলোকে পদ্মশ্রী ড. বিষ্ণু শ্রীধর বাকনকর ▯ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ▯ ৩২

মেদিনীপুরের গয়নাবড়ি ▯ চূড়ামণি হাটি ▯ ৩৩

অযোধ্যায় আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে শ্রীরামচন্দ্রের ভব্য মন্দির ▯ ড. প্রণব বর ▯ ৩৫

অযোধ্যার রামমন্দির ও ইতিহাস নতুন করে ফিরে দেখা ▯ বিমল শঙ্কর নন্দ ▯ ৪৩

রামমন্দির সংগ্রাম : ৫০০ বছরের ইতিহাস ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ৪৫

আজকের রামমন্দির আগামী দিনের রামরাজ্য ▯ শচীন্দ্রনাথ সিংহ ▯ ৪৭

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২ ডিসেম্বর
২০১৯

প্রকাশিত হবে
২ ডিসেম্বর
২০১৯

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মহাপুরুষের লাঞ্ছনা

সম্প্রতি জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি ভেঙেছে অতি বাম ছাত্র নেতারা। মূর্তির বেদীতে বিজেপিকে উদ্দেশ্য করে লেখা অশ্রাব্য গালিগালাজের ছবি সব সংবাদমাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে। নক্কারজনক এই ঘটনার অভিঘাতে সারা দেশ স্তম্ভিত। ইতিমধ্যে নিন্দায় মুখর হয়েছেন অনেকে। প্রশ্ন হলো, বামপন্থীদের এহেন আচরণ কি নতুন? এর আগে কি তারা বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে অপমান করেনি? একবার নয়, বারবার করেছে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয়— মহাপুরুষের লাঞ্ছনা। লিখবেন অচিন্ত্য বিশ্বাস, রন্তিদেব সেনগুপ্ত, জিষ্ণু বসু, সঞ্জয় সোম প্রমুখ।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata**

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

এই সংযম শিক্ষণীয়

অযোধ্যা মামলার রায় প্রকাশিত হইবার পর দুইটি সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইয়াছে। এই দুই সপ্তাহের ভিতর এই রায়কে কেন্দ্র করিয়া দেশের কোনো প্রান্ত হইতেই কোনোরকম অপ্রীতিকর ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বরং এই রায়ের পর দেশের গরিষ্ঠ অংশের মানুষের ভিতরই এক ধরনের প্রাপ্তির হাসি লক্ষ্য করা যাইতেছে। মনে হইতেছে, দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানের পর ন্যায্য প্রাপ্তিতে তাহারা সন্তুষ্টই হইয়াছে। কিন্তু এই প্রাপ্তির ফলে বাঁধনভাঙা আনন্দে তাহারা যে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে—তাহাও নহে। বরং তাহাদের ভিতর সংযমের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। রামমন্দির সংক্রান্ত মামলার রায় প্রকাশ হইবার পর সমগ্র দেশবাসী যেভাবে সংযমের সহিত সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে গ্রহণ করিয়াছে—তাহা শিক্ষণীয়। শুধু শিক্ষণীয়ই নহে, অভূতপূর্বও বটে। অযোধ্যায় রামমন্দির সংক্রান্ত রায় প্রকাশের পূর্বে অনেকেরই আশঙ্কা ছিল, এই রায়কে কেন্দ্র করিয়া দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিতে পারে। এমন আশঙ্কা অমূলক ছিল ইহাও বলা যাইবে না। দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিয়া আসা রামমন্দির মামলাকে কেন্দ্র করিয়া সব শ্রেণীর মানুষের ভিতর একটি চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। ফলে, সামান্য একটু প্ররোচনাই যে আগুনে ঘৃতাহুতির কার্য করিতে পারে—সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। কেন্দ্র সরকার এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিল। অযোধ্যায় তাহারা প্রচুর কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পুলিশ মোতায়েন করিয়াছিল। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন—রামমন্দির সংক্রান্ত মামলার রায় যাহাই হউক না কেন, তাহা শান্ত চিত্তে গ্রহণ করিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক পূজনীয় মোহন ভাগবতও সুপ্রিম কোর্টের রায়কে মান্যতা দিয়া শান্ত থাকিবার কথা বলিয়াছেন। দেশবাসী ইহাদের আবেদনকে মান্যতা দিয়াছে। রায় প্রকাশিত হইবার পর কোনোরূপ প্ররোচনার ফাঁদে তাহারা পা দেয় নাই। বরং, শান্ত চিত্তে এই রায়কে গ্রহণ করিয়া সংযমের পরিচয় দিয়া প্রমাণ করিয়াছে, প্রধানমন্ত্রী এবং দেশের শাসক দল ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি তাহাদের আস্থা রহিয়াছে।

তবে, প্ররোচনাদাতারা যে একেবারে নিশ্চুপ হইয়া গিয়াছে—এমন ভাবাও ভুল হইবে। রায় প্রকাশিত হইবার দিবস হইতেই এই প্ররোচনা দাতারা নানাবিধ উপায়ে সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজকে উত্তেজিত এবং বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। তাহাদের সেই অপচেষ্টা এখনও অব্যাহত রহিয়াছে। এই প্ররোচনা দাতাদের ভিতর সুপ্রিম কোর্টের জনৈক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি যেমন আছেন, তেমনই বামপন্থী এবং সেকুলার বুদ্ধিজীবীগণ ও এক শ্রেণীর সংবাদমাধ্যমও রহিয়াছে। এতদ্‌সত্ত্বেও মজার বিষয় হইতেছে যে, ইহাদের এই প্ররোচনার ফাঁদে অদ্যাবধি হিন্দু বা মুসলমান কোনও সম্প্রদায়েরই মানুষ ধরা দেয় নাই। বরং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অযোধ্যায় রায়ের পর এই বার্তাই দিয়াছে, ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার প্রতি তাহাদের আস্থা রহিয়াছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়কে তাহারা সম্পূর্ণ মান্যতা দিতেছে। এবং পাশাপাশি, এই প্ররোচনাকারীদের প্রকৃত রূপ তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে।

অযোধ্যায় রামমন্দির সংক্রান্ত মামলার রায়ের পর সমগ্র দেশবাসী যে সংযমের বার্তা দিয়াছে—ইহার একটি গুরুত্ব রহিয়াছে। প্রথমত, শ্রীরামচন্দ্র যে ভারতীয় অস্মিতার প্রতীক—ইহা এখন সকলেই স্বীকার করিতেছেন। দ্বিতীয়ত, সুপ্রিম কোর্টের রায়কে মান্যতা দিয়া ভারতীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিটিকেই দেশবাসী আরও সুদৃঢ় করিয়াছে। সমগ্র ভারতকে ঐক্যের বন্ধনে শ্রীরামচন্দ্রই যে বাঁধিতে পারেন—তাহা আরও একবার প্রমাণ হইয়াছে।

সুভাষিতম্

কাকচেষ্টা বকেধ্যানং শ্বাননিদ্রা তথৈব চ।

অল্পাহারী গৃহত্যাগী বিদ্যার্থী পঞ্চলক্ষণম্।।

কাকের মতো চেষ্টা, বকের মতো ধ্যান, কুকুরের মতো নিদ্রা, মিতাহারী ও গৃহত্যাগী—এই পাঁচটি প্রকৃত বিদ্যার্থীর লক্ষণ।

রেখেছ কমিউনিস্ট করে, মানুষ করোনি

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কি কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য হয়েছেন? বিশেষ করে বিজেপির। প্রশ্নটা ভীষণ ভীষণ অবাক করল তো? হয়তো ভাবছেন ভারতের দোর্দণ্ডপ্রতাপ ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা বিসিসিআই-এর প্রেসিডেন্টের আর কী দায় পড়ল, যে তাকে রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে হবে? আসলে হয়তো ঠিকই ভাবছেন, কিন্তু সৌরভের একটি জনপ্রিয় টিভি অনুষ্ঠানকে ঘিরে তাঁর ওপর যেভাবে আক্রমণ শানানো হচ্ছে, সেই আক্রমণকারী কমিউনিস্টরা কেবল তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপরই এমন আক্রমণ করে থাকে। 'দাদাগিরি'তে ভূতের বিশ্বাসের গল্প ছড়াচ্ছেন সৌরভ, এমনই অভিযোগে তাঁকে বয়কটের ডাক উদযাপিত করেছে কমিউনিস্টরা, অবশ্যই সোশ্যাল মিডিয়ায়। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় 'কুসংস্কার' ছড়াচ্ছেন কিনা, সেটা আমাদের বিবেচ্য নয়; যদি তাঁর মন্তব্য পছন্দ না হয় তবে যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করতে এই গণতান্ত্রিক দেশে কে আটকাচ্ছে?

কিন্তু 'সংস্কার' বস্তুটি কমিউনিস্টদের কাছে শেখার কী পরিণাম হতে পারে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে নতুন করে সেকথা বলার দরকার নেই। আসল সমস্যা অন্য জায়গায়, ভূতের গল্পে বিশ্বাস করা', 'কুসংস্কার ছড়ানো' এসব তো অছিলা মাত্র। সৌরভের 'অপরাধ' বিসিসিআই সভাপতি হওয়ার আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ এবং বিসিসিআই সচিব হিসাবে তাঁর সহকর্মী অমিত পুত্র জয় শাহ। ভূতেদের মুচকি হাসতে দেখা গিয়েছে কিনা তা জানি না, তবে অদৃষ্টের বিলোল কটাক্ষের সামনে আমরা সবাই রয়েছি। প্রায় একযুগ আগে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যখন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের 'অনুপ্রেরণা'য় তাঁর ক্রিকেট জগতের গুরু জগমোহন ডালমিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে যান, বুদ্ধবাবুর অহংপূর্ণ উক্তির তখনও অবসান হয়নি, দখলদারির সেই রাজনীতির বোড়ে সৌরভ নিজের ভুল বুঝতে পেরে ডালমিয়ার কাছে নিজের অনুতাপও প্রকাশ করেন। সৌরভ কিন্তু তখন ছিলেন মহান কমরেড। জ্যোতিবাবুর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার ছবিও কারোর অজানা ছিল না।

এহেন সৌরভ আর কমিউনিস্টদের কথায় উঠছেন-বসছেন না, তার ওপরে পাকিস্তানের জঙ্গিরা আমাদের সেনার ওপর হামলা চালালে বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ম্যাচ বয়কটের ডাক দিচ্ছেন, এতটা 'সাম্প্রদায়িক' মনোভাবের সঙ্গে আর যারাই হোক, জেহাদপন্থী ভারতীয় বামপন্থার পক্ষে আপস করা সম্ভব নয়। বামপন্থীদের এই সযত্ন লালিত রাগ তাদের

বিশ্বামিত্র-র
কলম

একদা 'অনুরাগী' সৌরভের ওপর সেদিন থেকেই ছিল, আজ ভূত-বিশ্বাসের অছিলায় ভূতে-পাওয়া বামপন্থীরা তাদের লেজুড় 'বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী মঞ্চ' ইত্যাকার হ য ব র ল-র মাধ্যমে সেই রাগ মেটাচ্ছে। ভোটবাক্সে ভূতের নৃত্য তৃণমূল তো বহু পরে দেখিয়েছে, সত্যি কথা বলতে কী বামপন্থীরাই এই ভোটবাক্স-ভূতের আবিষ্কারক। যেখানে ধরুন এক হাজার ভোটার, অথচ ভোট পড়ে এগারোশো, এর মধ্যে এক হাজার নিরানব্বইটি আবার কমিউনিস্ট দলের পক্ষে— এমন নমুনা বিগত চৌত্রিশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ঢের ঢের দেখেছেন।

মোদ্দা কথাটা হলো এধরনের অসভ্যতা বামপন্থীদের মজ্জাগত, আর সম্প্রতি এর শিকার হলেন পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙ্গালির গর্ব সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি নিজের ক্রিকেট প্রজ্ঞায় ভারতীয় ক্রিকেটকে বিশ্বের দরবারে সম্মানিত করেছেন, খেলোয়াড় হিসাবে এবং এখন প্রশাসক হিসাবেও তা করছেন। বাঙ্গালির মুখোজ্জ্বলকারীদের সাম্প্রতিক তালিকাটা একেবারেই ছোটো এবং সৌরভ নিশ্চয়ই সেই তালিকায় সর্বাগ্রে থাকবেন। তাতে বামপন্থীরা যতই কাদা ছেটানোর চেষ্টা করুন না কেন, বামপন্থার কর্দমাক্ত রূপ বাঙ্গালিরা অন্তত হাড়ে হাড়ে চেনে। সুতরাং এদের মানুষ এখন হাসির খোরাক বলেই দেখেন, আদর্শ বা রাজনৈতিক দল হিসেবে নয়।

একটা কথা মনে রাখবেন বামপন্থীদের অতীত বলে বাঙ্গালি তথা ভারতীয়দের শ্রদ্ধার ব্যক্তি ও বস্তুকে অপমান করা, বিশ্বের দরবারে হেয় করা এদের মজ্জাগত। বেশিদূর যেতে হবে না, সাম্প্রতিককালেই দেখুন জেএনইউতে বর্বর কমিউনিস্টরা নির্বিচারে বিবেকানন্দের মূর্তি ভাঙল, ইতরামির একশেষ করলো। আর পশ্চিমবঙ্গের মহান বামপন্থীগণ, তাদের অবস্থা তো আরও নক্কারজনক। একটি বাজারি সংবাদমাধ্যমের প্রকাশনা সংস্থা, যেখানে জেল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত এক নকশাল নেত্রীর গরিব-গুর্বোর থেকে লুঠ করা টাকা খাটছে বলে কলেজস্ট্রিট মার্কেটের খবর, সেখানে কর্মরতা এক তথাকথিত সাহিত্যিক, বামপন্থী বলেই পরিচিতা, স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে বলেছেন গেরুয়াপন্থীরা বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে অমার্জনীয় কাজ করেছেন। এরপর আলতো করে জুড়ে দিয়েছেন এখন বিবেকানন্দের বেলায় আফশোস করে কী লাভ! বিবেকানন্দের মূর্তি ভাঙায় তাঁর মতো বামপন্থীরা উল্লসিত হতেই পারে, কিন্তু ম্যাডাম বিদ্যাসাগর মূর্তি গেরুয়াপন্থীরা ভেঙেছে আপনাকে কে বলল? আপনি কি সিসিটিভি ফুটেজ দেখেছেন। নাকি আর পাঁচটা বামপন্থী ও কমিউনিস্ট তৃণমূলিদের মতো জানেন ফুটেজ প্রকাশ্যে এলে 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি' ক্ষুণ্ণ হবে? বিদ্যাসাগর কলেজের সাধারণ সম্পাদক, তাঁদের মতে তো জানি মূর্তি ভাঙার রেওয়াজ আছে। সুতরাং এটা কাদের চ্যালাচামুণ্ডাদের কাজ বোঝাই যায়। আর এদের মতাদর্শ কী, ৭০-এর দশকে কলেজস্কোয়ারে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয়েছিল।

সুতরাং মহান কমিউনিস্টগণ, প্রেসিডেন্সিতে আপনাদের জাতভাইকে (যাদের কাছে একদা শ্রেণীশত্রু বলে বিবেচিত হতেন) গট আপ গেমে হারানোর আনন্দে বিভোর থাকুন, আর নরেন্দ্র মোদীকে সরিয়ে কারাট ইয়েচুরি জুটিকে প্রধানমন্ত্রী করে ইমরান-ভাইয়ের ঋণ শোধ করার দিবাস্বপ্ন দেখুন, এখন বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে সৌরভ গাঙ্গুলি আপনাদের দুচোখের বিষ তো হবেনই। ভাগবান আপনাদের দেশদ্রোহী কমিউনিস্ট করেই রেখেছেন, মানুষ হওয়া দূর অস্ত। ■

দিদিকে বলে লাভ নেই

মাননীয় রাজ্যপাল
জগদীপ ধনকড়
রাজভবন, কলকাতা

স্যার, আপনি কিন্তু রাজভবনে থেকে রাজনীতি করছেন। না, এটা আমার কথা নয়। এটা দিদি বলেছেন। দিদিও মুখে বলেননি। তৃণমূল কংগ্রেস বলছে, তৃণমূলের নেতারা বলছেন। আর তৃণমূল কংগ্রেস মানেই দিদি মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আপনি অবশ্য জবাব দিতে দেরি করেননি। যেদিন অভিযোগ উঠেছে সেদিনই এর জবাব দিয়েছেন। শিলিগুড়িতে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, রাজ্যপালকে অনুমতি দিয়েছে সংবিধান। বলেছেন, "রাজ্যপাল কেন্দ্রের এজেন্ট। নির্বাচিত সাংসদ কিছু বলতেই পারেন। সংবিধানের অধিকারে ভয় না পেয়ে কাজ করব।"

আপনি জগদীপ ধনকড় রাজ্যপালের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই নানা ইস্যুতে রাজ্যের সঙ্গে আপনার সংঘাত লেগে রয়েছে। দুর্গাপুজো কার্নিভ্যাল থেকে জেলা সফর সব নিয়েই চলেছে প্রতিক্রিয়া পাল্টা প্রতিক্রিয়ার লড়াই। রাজ্যের মন্ত্রীদের বিভিন্ন উক্তি থেকে জেলাশাসকদের বক্তব্য অনেক কিছুতেই আপনি ব্যাথিত বলে জানিয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এমন অভিযোগও আপনার বিরুদ্ধে উঠেছে যে, রাজ্যে পৃথক প্রশাসন চালাচ্ছেন আপনি।

এই রাজ্যে দিদি ঘুরে ঘুরে শাসন চালান। এটায় তাঁর পেটেন্ট রয়েছে। এর পরে আপনিও সেই কাজ কেন করবেন! স্বাভাবিক ভাবেই আপনার জেলা সফর নিয়ে শাসকদলের অপছন্দের কথা আগেই সামনে এসেছে। এর পরে বুলবুল ঘূর্ণিঝড়ের রিপোর্ট না পাওয়া, হেলিকপ্টার চেয়ে না পাওয়া ইত্যাদি নিয়েও সংঘাত লেগেছে। এ হেন পরিস্থিতিতে রাজ্যসভায় শীতকালীন অধিবেশনের শুরুতেই রাজ্যপালের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে তৃণমূল। এটা আগে থেকেই ঠিক ছিল।

আর সেই দিনই যেন আপনিও জবাব ঠিক করে রেখেছিলেন। জেলায় জেলায় সফর করা অব্যাহত রাখবেন বলে রাজ্যকে একপ্রকার কড়া বার্তা দিয়ে দিয়েছেন আপনি রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়। একইসঙ্গে বলে দিয়েছেন, এ ব্যাপারে কারও কোনও অনুমতির প্রয়োজন নেই।

দু'মাস আগে শিলিগুড়ি থেকে জেলা সফর শুরু করেছিলেন আপনি। রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের ডাকা সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না শাসক দলের কোনও জনপ্রতিনিধি। এমনকী পুলিশকর্তারাও গরহাজির ছিলেন রাজ্যপালের বৈঠকে। সে নিয়ে প্রকাশ্যেই নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন আপনি। এর মাঝে সরকার-রাজ্যপাল বহু সংঘাত দেখেছে বঙ্গ রাজনীতি। রাজ্যপালের এখানে সেখানে চলে যাওয়া নিয়ে এক্তিয়ার লঙ্ঘনেরও অভিযোগ তুলেছেন শাসক দলের নেতারা। কিন্তু সেই শিলিগুড়িতে দাঁড়িয়েই রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান আপনি বললেন, "আমি সংবিধানের নামে শপথ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য কাজ করতে এসেছি। আমার যেখানে মনে হবে যাব। রাজ্যের যে কোনও প্রান্তে যাওয়ার আমার এক্তিয়ার আছে। এর জন্য কারও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই।" আপনার কথায়, "আমি যা করছি সংবিধান মেনে করছি। মানুষের জন্য করছি।" সত্যিই আপনি দাপট দেখাচ্ছেন। দিদির একান্ত অনুগত ভাই হয়েও বলছি, দিদির সামনে এমন করে কথা বলতে শুনিনি অতীতের কোনও সাংবিধানিক প্রধানকে।

আপনি উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় প্রশাসনিক বৈঠক ডেকেছিলেন। পৌঁছেও গিয়েছিলেন সেখানে। কিন্তু প্রশাসনিক আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা যাননি। তাই বৈঠকও হয়নি। সে নিয়ে শাসক দলের অনেকে বলেছিলেন, "রাজ্যপাল কাউকে কিছু না জানিয়েই চলে গিয়েছেন!" আপনি তারও জবাব দিয়েছেন। বলেছেন, "কেউ কেউ বলছেন, আমি নাকি কাউকে না জানিয়ে গিয়েছি। এটা একেবারেই ঠিক নয়। আমি যেখানে যেখানে গিয়েছি, রাজ্য সরকারকে জানিয়ে গিয়েছি। না হলে সার্কিট হাউস ব্যবস্থা করল কী করে?"

গত সপ্তাহে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন অনুষ্ঠান থেকে ফেরার সময়ে আপনি হঠাৎই চলে গিয়েছিলেন সিঙ্গুর বিডিও অফিসে। সে নিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য তীব্র তোপ দেগেছিলেন আপনার বিরুদ্ধে। এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছিলেন। এক মন্ত্রী রাজ্যপালকে কটাক্ষের সুরে বলেছিলেন, "উনি তো 'দিদিকে বলো'-তে ফোন করতে পারেন!" এটা সত্যিই আপনার পদের প্রতি মর্যাদাহানিকর। আমিও মেনে নিতে পারিনি।

আপনি বলেছেন, "কেউ কেউ বলছেন আমায় 'দিদিকে বলো'-তে ফোন করতে। আমি কিছু বলছি না। মুখ্যমন্ত্রীর উচিত এঁদের নিয়ন্ত্রণ করা।" আপনি বলেছেন। কিন্তু দিদি কি আদৌ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন! পারবেন না। কারণ, তাঁর মদতেই তো সবাই সরব। মনে রাখতে হবে তৃণমূল কংগ্রেস তথা পশ্চিমবঙ্গ মানেই দিদি মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

— সুন্দর মৌলিক

অতিথি কলম

রবিশঙ্কর প্রসাদ

অযোধ্যা মামলায় সর্বোচ্চ আদালতের যুগান্তকারী রায়দান

বাদী-বিবাদী পক্ষের অতি দীর্ঘসূত্রী বিক্ষোভ আন্দোলনের পর্ব পার করে মন্দির-মসজিদ বিতর্ক নিয়ে সর্বোচ্চ আদালতের রায় এই ভারতে নতুন প্রভাতের সূচনাকারী। ভারতের মানুষের হৃদয়ে রামের পরিচয় 'মর্যাদা পুরুষোত্তম' হিসেবে। নীতিবোধ ও মর্যাদাই তাঁর জীবনচর্যা ও দর্শনে প্রস্ফুটিত। বিগত হাজার হাজার বছর ব্যাপী তাঁর জীবনকথাই সমস্ত ভারতবাসীকে মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে আসছে। একইসঙ্গে রামকথাই সাধারণ ভারতবাসীর চিরকালীন সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার হিসেবে গণ্য হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এমন একটি দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা অতিগুরুত্বপূর্ণ মামলা যার বিষয়বস্তু শ্রীরামের জন্মস্থান অযোধ্যার নির্দিষ্ট কোন স্থানে তাই নিয়ে—তার পাকাপাকি নিষ্পত্তি হওয়া বিশেষ গৌরবের। মামলাটির চূড়ান্ত ও দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ আদালত টানা ৪০ দিনের নিরবিচ্ছন্ন শুনানির পর ৫ বিচারকের সর্বসম্মতিতে রায়দান করেছে। এই বিষয়টি শুরু থেকেই বিতর্কিত হয়ে ওঠে—পারস্পরিক স্বার্থ সঙ্ঘাতের পরিণতিতে মাঝে মধ্যেই চরম বিরোধিতা, এমনকি সংঘর্ষও ঘটেছে। এতদিনে আমাদের গরিমাময় সংবিধানের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আদালত সম্পূর্ন আইনী পদ্ধতিতে এই উত্তেজনাপ্রবণ বিতর্কের মীমাংসা করেছে। অত্যন্ত আনন্দ এই কারণে অনুভূত হচ্ছে যে সমগ্র ভারতবাসী একজোট হয়ে এই রায়কে স্বীকার করে নিয়েছে। এ বিষয়ে কোনো অসন্তোষ, বিরুদ্ধাচার কেউই করেনি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতা হিসেবে এই সাফল্যের পূর্ণ প্রশংসার যোগ্য। ভারতবাসীর কাছে তাঁর সংযত ও মিলে-মিশে থাকার আবেদন এই শান্তির বাতাবরণ জারি রাখতে বড় ভূমিকা নিয়েছে। একই সঙ্গে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক তৎপরতার সফল প্রয়োগে দেশে নিশ্চিত এক নতুন প্রভাতের সূচনা হয়েছে।

এবার ইতিহাসের কথায় ফিরব। মূলত আদালতে ছিল চারটি মামলা। (১) পূজারী গোপাল সিংহ, (২) নির্মোহী আখড়ার তরফে, (৩) উত্তর প্রদেশ কেন্দ্রীয় সুন্নী ওয়াকফ বোর্ড, (৪) ভগবান শ্রীরাম স্বয়ং অর্থাৎ রামলালা বিরাজমান। এই চার পক্ষই বিবাদিত জমিতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার মালিকানা দাবী করে ও একই সঙ্গে অন্য পক্ষদের বিপক্ষে ইনজাংশনও প্রার্থনা করে।

> এই রায়দানের ফলে কবির ও রহিমের বক্তব্যই সিদ্ধ হলো। তবে, আমার ব্যক্তিগত সম্মান ও গর্ব যে বেড়েছে তা জানাতে দ্বিধা নেই কেননা আমি এলাহবাদ আদালতে হিন্দুদের হয়ে 'রামলালার' পক্ষে সওয়াল করতে পেরেছিলাম।

ইলাহাবাদ উচ্চ আদালত হিন্দু পক্ষকে সমগ্র অঞ্চলের কেন্দ্রীয় স্থলে পূজা অর্চনার অধিকার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই স্থানটিও হিন্দুদের অর্পণ করে কিছুটা রিলিফ দেয়। এছাড়া সমগ্র বিবাদিত অঞ্চলটিকে তিন ভাগে ভাগ করে হিন্দু সম্প্রদায়, নির্মোহী আখড়া ও মুসলিমদের মধ্যে সমবন্টন করার আদেশ দেয়। এই রায়কে সর্বোচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়। এরই পরিণতিতে সর্বোচ্চ আদালতের এই চূড়ান্ত রায়দান। মামলা চলাকালীন প্রমাণ হিসেবে বিপুল পরিমাণ নথিপত্রের মধ্যে মৌখিক ও সরকারি তথ্যাদি যুক্ত প্রমাণপত্র উভয়ই ছিল। যেগুলির সামগ্রিক পরিমাণ হাজার হাজার পাতা। এই বিপুল তথ্যাদির পারস্পরিক প্রামাণ্যতা ও যুক্তিগ্রাহ্যতা সমস্ত কিছুই আদালত বিচার বিশ্লেষণ করে নেয়। দু' একটি উদাহরণ তুলে ধরব।

১৭৪০ সালে জোসেফ টিয়েফেনথালার নামে একজন জেস্যুইট পাদ্রি ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছিলেন। উচ্চারণের অসুবিধে হেতু তিনি অযোধ্যাকে 'এ্যাডজুডিয়া' বলে বর্ণিত করলেও এটি যে পবিত্র স্থল তা লিখতে ভোলেননি। তিনি নির্দিষ্ট করে একটি বেদীর উল্লেখ করেছিলেন। তিনি খানিকটা দোলনা আকারের কিছুকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যেখানে 'Beschan' অথাৎ ভগবান বিষ্ণু রাম রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব পর্যবেক্ষণ পর্ষদের ইংরেজ

আমলের মহানির্দেশক আলেক্সজান্ডার কানিংহাম তাঁর ১৮৬২ সালের দেওয়া সমীক্ষা রিপোর্টে জানান অযোধ্যায় শ্রীরামের জন্মস্থান।

ফৈজাবাদের প্রাচীন কমিশনার ও ইংরেজ সেটেলমেন্ট আধিকারিক পি. কারনেগি তাঁর ১৮৭০ সালের প্রতিবেদনে জানান ''Ajudhia is to Hindus what Mecca is to Mohammedans'' আদালত তার রায়ের ৭৮৬ নং অনুচ্ছেদে চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে— বিদেশিরা তাদের লেখায় বিশদভাবে হিন্দুদের বিশ্বাস ও রামজন্মভূমির প্রতি আত্মিক সমর্থনের ও নির্দিষ্ট জন্মস্থান স্থির করেই তাদের আরাধ্য দেবতার পূজা করে আসছে।

একই সঙ্গে বিচারপতিরা এটাও বিবেচনাধীন করেছেন যে ৩২৫ বছর আগে মসজিদ নির্মাণের পর থেকে ইংরেজরা ওই অঞ্চলে একটি লৌহ প্রাচীর (grill wall) তৈরি করা পর্যন্ত মুসলিমরা ওই বিবাদিত মসজিদের যে স্বত্বাধিকারী ছিল ও তাদের অধিকার বজায় রেখেছিল এমন উপযুক্ত প্রমাণ তারা দিতে পারেনি।

অপরপক্ষে মৌখিক ও লিখিত প্রমাণ ভিত্তিক সূত্রে এটাই প্রতিষ্ঠিত হয় যে হিন্দুরা অনাদি কাল ধরে দৃঢ় বিশ্বাসে রামের অনুগত ভক্ত হিসেবে ও নির্দিষ্ট স্থানটিকে তারা নিশ্চিতভাবে তাদের আরাধ্য দেবতার জন্মস্থান বলে মনে করে নিরবচ্ছিন্নভাবে পূজা অর্চনা করে এসেছে। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে আদালত বহু মুসলিম ধর্মবলম্বী সাক্ষী আদালতে তিন গম্বুজ সম্বলিত ধাঁচা সংলগ্ন অঞ্চলে হিন্দুদের ধর্মীয় পরিচয়ের প্রতীক জয়-বিজয়, গরুড় জাতীয় পক্ষীর প্রস্তর নির্মিত প্রতিরূপ পাওয়ার তথ্যকে মান্যতা দিয়েছেন। এই আদালত তার পর্যবেক্ষণে এই প্রমাণগুলি কেবলমাত্র ধর্মবিশ্বাস ও দেবতার অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপ নয়, এগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ওখানে পূজা অর্চনা যে হয়ে এসেছে তারই পর্যাপ্ত প্রমাণ বলে মনে করে। এ থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয় যে ইট চুন দিয়ে তৈরি সৌধই মাত্র ধ্বংস করা হয়নি— ধ্বংস করা হয়েছিল একটি যুগ যুগান্ত ধরে চলে আসা প্রাণবন্ত ধর্মবিশ্বাস ও তার পুজ্যকে আরাধনা করার নিরন্তর প্রবাহকে।

মনে রাখতে হবে আদালত বিবাদিত স্থানটি উপযুক্ত প্রমাণের ভিত্তিভূমি থেকে মামলাকারী হিন্দুদের অধিকারে দেওয়ার পাশাপাশি মুসলিমরা যাতে বঞ্চিত বা একতরফা বিচার না মনে করেন, সেই কারণে অপর মামলাকারী সুন্নী ওয়াকফ বোর্ডকে ৫ একর জমি যাতে সরকার দেয় তারও সমান্তরাল নির্দেশ দিয়েছে। আদালত কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি ট্রাস্ট গঠন করে তার মাধ্যমেই মন্দির নির্মাণের আদেশ দিয়েছে। আদালত আরও বলেছে মন্দির নির্মাণের প্রয়োজনীয় জমি বন্টনের পর এমন ব্যবস্থা যেন রাখা হয় যাতে উদ্বৃত্ত জমি জনহিতকর কাজে নিয়োজিত হয়। এই সূত্রে এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের রায়ের ভিত্তিতে আনা নির্মোহী আখড়ার মামলাও শীর্ষ আদালত খারিজ করে দেয়। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, ধর্মীয় আচরণেরও (উভয় পক্ষেরই) বিশ্লেষণ করে। সব বিশ্লেষণই সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পটভূমিও আলোচনার পরিসরে আসে। ধর্মীয় অভ্যাসের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির মিলনও যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয় সেই বিষয়টিও আদালতের নজর এড়ায়নি। আদালতের চোখে পারস্পরিক সংস্কৃতির মিলনে কখনই কোনও ধর্মীয় তত্ত্ব ধ্বংস বা খারিজ হয়ে যায় না।

উপসংহারে বলা যায়, এই রায়দানের ফলে কবির ও রহিমের বক্তব্যই সিদ্ধ হলো। তবে, আমার ব্যক্তিগত সম্মান ও গর্ব যে বেড়েছে তা জানাতে দ্বিধা নেই কেননা আমি এলাহবাদ আদালতে হিন্দুদের হয়ে 'রামলালার' পক্ষে সওয়াল করতে পেরেছিলাম।

(লেখক বর্তমানে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী)

রাষ্ট্রায় স্বাহা, রাষ্ট্রায় ইদং ন মম

আহ্বান : দেশের জন্য এক বছর সময় দান করুন

জমিতে অত্যধিক রাসায়নিক সার ও বিষ ব্যবহারের কারণে চাষে ক্ষতি হচ্ছে, যার ফলে চাষিভাইরা চাষ ছেড়ে দিচ্ছেন। এইসব কৃষিপণ্যের ফলে মানুষ বিভিন্নভাবে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। গ্রামে রোজগারের অভাবে মানুষ শহরের দিকে পলায়ন করছে। গো-পালন ছেড়ে দেওয়াতে গো-বংশ কসাইয়ের হাতে চলে যাচ্ছে।

চাষিদের এবং গো-বংশকে এই গভীর সংকটময় অবস্থা থেকে রক্ষা করলেই গ্রাম ও দেশ রক্ষা হবে। এর জন্য গ্রামে গ্রামে গিয়ে চাষিদের গো-ভিত্তিক চাষ ও গো-ভিত্তিক জীবনপদ্ধতি সম্পর্কে অবগত করাতে হবে। এতে গোরুর দ্বারা চাষির রক্ষা হবে ও চাষির দ্বারা গোরুর রক্ষা হবে। এটাই হচ্ছে ভারতবর্ষকে পরম বৈভবশালী করার পথ।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি গ্রামে এই জ্ঞান-আলোক পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপ্রেমী, গো-প্রেমী, সেবা-ভাবী যুবক-যুবতীদের আহ্বান করা হচ্ছে, যারা বাড়ি ছেড়ে ন্যূনতম এক বছর সময় এই মহৎ কাজের জন্য দান করবেন।

এই বিষয়ে পথনির্দেশ, প্রশিক্ষণ ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা সংস্থার দ্বারা করা হবে। বয়সসীমা ৩৫-৫০ বছর।

লিখিত আবেদন নিম্ন ঠিকানা বা ই-মেলে পাঠাতে পারেন—

গো-সেবা পরিবার

৫২৪-বি, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৩

E-mail : gosevaparivar@gmail.com

www.gosevaparivar.org

রম্যরচনা

বিজ্ঞাপনের ফাঁদে

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন— এক সপ্তাহে পাঁচ কেজি ওজন কমান। রতনের ওজন ১০৫ কেজি। রতন ফোনে যোগাযোগ করল। কোকিলকণ্ঠে উত্তর এলো, ভোর পাঁচটায় জগার স্যুট পরে রেডি থাকবেন। ভোরে কলিং বেল বাজতেই রতন দরজা খুলে দেখল এক সুন্দরী জগার স্যুট পরে হাজির। মেয়েটি বলল, আমাকে ধরতে পারলেই আমি আপনার। বলেই দৌড়তে লাগল। আর রতনও মেয়েটিকে ধরার চেষ্টা করতে লাগল। এক সপ্তাহ বাদে রতন ১০০ কেজি হয়ে গেল। এবার রতন যোগাযোগ করল আরও ১০ কেজি কমাবার জন্য। এবার আরও সুন্দরী কুড়ি বছরের একটি মেয়ে। এক সপ্তাহ বাদে রতনের ওজন হলো ৯০ কেজি। রতন ভাবল আর একটু ওজন কম হলেই ও মেয়েটিকে ধরে ফেলতে পারবে। তাই এবার ২০ কেজি কমাবার জন্য যোগাযোগ করল। পরদিন ভোরে দরজা খুলে রতনের দম প্রায় বন্ধ হবার জোগাড়। সামনে দাঁড়িয়ে কালো মোটা এক মহিলা। মহিলা বললেন, আপনি আগে দৌড়বেন আর আমি পিছনে। মনে রাখবেন আপনাকে ধরতে পারলে আপনি আমার হয়ে যাবেন। এবার রতনের দৌড় কে দেখে...।

উবাচ

"এই সভায় একদিন তিন তালাক বিরোধী বিল নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন সভা বোধহয় বিলটি অনুমোদন করবে না। কিন্তু এই সভা সেদিন বিলটি অনুমোদন করে চূড়ান্ত বিচক্ষণতার প্রমাণ দিয়েছিল।"

রাজ্যসভার ২৫০তম অধিবেশনের ভাষণে

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

"পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ মানুষ চিটফান্ডে নিঃস্ব। রাজ্য সরকার কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। কারণ শাসকদলের বহু বিধায়ক ও সাংসদ চিটফান্ডগুলির সঙ্গে যুক্ত।"

চিটফান্ড কেলেঙ্কারি প্রসঙ্গে

দিলীপ ঘোষ
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপির সভাপতি

"রাজ্যের যেখানে দরকার পড়বে সেখানেই যাব। কারোও অনুমতি নেবার প্রয়োজন আমার নেই।"

পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক প্রশাসন-রাজ্যপাল সংঘাত প্রসঙ্গে

জগদীপ ধনকড়
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল

"পুলিশের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করে কালিয়াগঞ্জ উপনির্বাচনে ভোটলুটের পরিকল্পনা করছেন রাজ্যের এক ক্যাবিনেট মন্ত্রী।"

পশ্চিমবঙ্গে অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে

কৈলাশ বিজয়বর্গীয়
বিজেপির সর্বভারতীয় নেতা

ভারতবাসীর অস্মিতা বিজেপিই বুঝেছিল

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

অযোধ্যায় রামমন্দির মামলার রায় ঘোষণার পর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক পূজনীয় মোহন ভাগবত বলেছেন, এই রায়ে কারো জয় বা পরাজয় হয়নি। একই কথা বলেছেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। সঙ্ঘ প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী দুজনের বক্তব্যেই পরিষ্কার যে, তাঁরা প্রথম থেকেই সতর্ক এবং সচেষ্ট ছিলেন এই রায়ে যেন কোনোরকম রাজনৈতিক রং না লাগে। অযোধ্যা রায়ে রাজনৈতিক রং লাগলে তাতে যে ভারতীয় জনতা পার্টির উপকার বিশেষ হবে না, বরং ক্ষতিরই সম্ভাবনা বেশি তা তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন। আর একটি শঙ্কাও অবশ্য সঙ্ঘ এবং বিজেপি নেতৃত্বের ছিল। তা হলো, রায়ের ফলাফল অনুকূল হওয়ার পরে যদি সঙ্ঘ ও বিজেপির কিছু অতি উৎসাহী এবং অবিবেচক সমর্থক উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করে ফেলে, তাহলে দেশের সম্প্রীতির পক্ষে তা ক্ষতিকর হবে। এবং সে দায়ভারও শেষ পর্যন্ত সঙ্ঘ ও বিজেপির উপর এসে পড়বে। যে কারণেই সঙ্ঘ ও বিজেপি উভয় পক্ষ থেকেই রায় বেরনোর প্রাক্কালে বারবার আবেদন জানিয়ে বলা হয়েছিল— রামমন্দিরের রায় যাই হোক না কেন তা শান্তচিত্তে মেনে নিতে। এবং একথাও অস্বীকার করলে চলবে না সর্বত্র সঙ্ঘ এবং বিজেপি কর্মীরা তাদের নেতৃত্বের এই নির্দেশকে মান্যতা দিয়েছেন। এই রায় বেরোনর পর তাঁরা কোথাও কোনোরকম উৎসাহের আতিশয্য প্রকাশ করেননি। বরং, সব জায়গাতেই তারা সংযম প্রকাশ করেছেন। সে যাই হোক না কেন, এই রায়ের যে একটি রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে— তা সবাই মানেন। এমনকী, সঙ্ঘ এবং বিজেপি নেতৃত্বও তা জানেন। এই তাৎপর্যটি কী? আমরা চাই বা না চাই, রামমন্দির আন্দোলনে একটি রাজনৈতিক রং অনেক আগেই লেগে গিয়েছে। অযোধ্যায় বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের সময় বা লালকৃষ্ণ আদবানীর রামরথযাত্রার সময় সেই রাজনৈতিক তাৎপর্য থাকবেই তা স্বাভাবিক। অযোধ্যায় রামমন্দির রায় ঘোষিত হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই, হিসাব নিকাশ চলবে এই রায় রাজনৈতিকভাবে কার পক্ষে যাবে। অর্থাৎ এক কথায়, এই রায়ের ফলে কে রাজনৈতিক সুবিধা পাবে।

অযোধ্যায় ওই জমিকে রাম জন্মস্থান হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে সেখানে রামমন্দির গড়ে তোলার দাবিটি রাজনৈতিকভাবে একমাত্র বিজেপিই তুলেছে। শিবসেনা, হিন্দু মহাসভার মতো কিছু রাজনৈতিক দল এই দাবিকে সমর্থন জানালেও, এই দাবিকে ব্যাপক আকারে জনআন্দোলনের রূপ দিতে পেরেছে একমাত্র বিজেপিই। অন্যদিকে, কংগ্রেস, সমাজবাদী, বামপন্থী এবং অন্যান্য বিজেপি বিরোধী দল প্রথমাবধিই অযোধ্যায় ওই জমিতে রামমন্দির নির্মাণের বিরোধিতা করেছে। রামমন্দির নির্মাণের দাবিতে বিজেপি এবং সঙ্ঘ একসময় তাদের আন্দোলনকে চড়া মাত্রায় নিয়েও গিয়েছে। বাবরি ধাঁচা ধ্বংস তারই প্রমাণ। তদুপরি, বিজেপি তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারেও বারেবারেই রামমন্দির নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সমগ্র ভারতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর মধ্যে রামচন্দ্রের নাম এক আবেগ সৃষ্টি করে। তার ভিতর দেশের হিন্দিভাষী রাজ্যগুলিতে এই আবেগ অনেকটাই বেশি। রামমন্দিরকে কেন্দ্র করে একমাত্র বিজেপির আন্দোলন এবং অযোধ্যায় রামমন্দির স্থাপনে বিজেপির প্রতিশ্রুতি বিজেপির প্রতিই এই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সহানুভূতিশীল করেছে। নির্বাচনী রাজনীতিতে তার সুফলও লাভ করেছে বিজেপি। আবার এর একটি উল্টোদিকও আছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলেই রামমন্দির প্রতিষ্ঠা হবে— এমন একটি আকাঙ্ক্ষাও আকাশ ছুঁয়েছে সেই ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী প্রথমবার ক্ষমতায় আসায়। কিন্তু নরেন্দ্র

শবরীমালা সংক্রান্ত রায় কেরলে বিজেপিকে আরও শক্তিশালী করবে। আর একথা বলতেই হচ্ছে, সাম্প্রতিক কালের এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রায় প্রমাণ করেছে, বিজেপি ভুল পথে চলেনি।

মোদীর শাসন ক্ষমতার প্রথম পাঁচ বছরে সুপ্রিম কোর্টে রামমন্দির মামলার শুনানিতে দীর্ঘসূত্রতা ছাড়া আর কিছুই যখন হয়নি— তখন হিন্দুদেরই একটি অংশ ক্ষুব্ধ হয়েছে। নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় থাকতেও কেন রামমন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হচ্ছে না— আবেগতাড়িত হয়ে এ প্রশ্নও তাঁরা তুলেছেন। কেউ কেউ আরও এক ধাপ এগিয়ে এসে বলেছেন, অর্ডিনান্স জারি করে অবিলম্বে অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করে দিক। যারা আবেগতাড়িত হয়ে এইসব কথাবার্তা বলেছেন, তাদের ভিতর শিক্ষিত মানুষজনও রয়েছেন। সরকার যে আবেগে চলে না, তার যে কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে— সে সত্যটিই তারা মানতে চাননি। নরেন্দ্র মোদীর সাফল্য এখানেই তিনি সরকার চালাতে গিয়ে এরকম আবেগে ভেসে যাননি। তিনি বুঝেছিলেন, আবেগে ভেসে কোনো সিদ্ধান্ত নিলে ভবিষ্যতে তার মূল্য চোকাতে হবে বিজেপিকে। আবেগে না ভেসে তাই তিনি সুপ্রিম কোর্টের রায়ের জন্য অপেক্ষা করাই শ্রেয় মনে করেছিলেন। নরেন্দ্র মোদীর এই পদক্ষেপে অতি উৎসাহী কেউ কেউ অধৈর্য হয়ে পড়লেও, মোদী এবং তাঁর সহযোগীরা জানতেন, রাজনীতিতে ধৈর্যই শেষ পর্যন্ত সাফল্য এনে দেয়। ধৈর্য হারানোটা রাজনীতিতে পাপ। এবং এ কারণেই নরেন্দ্র মোদী বারবার বলেছেন, সুপ্রিম কোর্টের রায় দেখার পর যা সিদ্ধান্ত তা নেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সহযোগীরা জানতেন সুপ্রিম কোর্টের রায়ের জন্য অপেক্ষা করাটাই বিবেচকের কাজ হবে। সুপ্রিম কোর্টের রায় যদি পক্ষে যায়, তাহলে তা খুবই ভালো। আর বিপক্ষে গেলে আন্দোলনের দরজাটা তখন খুলে দেওয়া যাবে। কিন্তু তা না করে যদি আগেই অর্ডিনান্স করে মন্দির করার চেষ্টা হয়, তবে তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যে কেউ আদালতে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আদালতে মুখ পোড়ার আশঙ্কা থাকে বিজেপির।

রামমন্দিরের সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং তাৎপর্য যেভাবে সঙ্ঘ এবং বিজেপি বুঝেছে, কংগ্রেস সেভাবে বোঝেনি বা বুঝতে চায়নি। এক্ষেত্রে কংগ্রেসের বাধ্যবাধকতার কারণটি ছিল সংখ্যালঘু ভোট। বিজেপির সেই বাধ্যবাধকতাটি ছিল না। এ বাধ্যবাধকতা থাকলেও অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ নিয়ে কংগ্রেস যে উগ্র বিরোধিতা করেছিল তার কোনো দরকার ছিল না। সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করতে গিয়ে কংগ্রেস নেতা এবং আইনজীবী কপিল সিব্বাল যে আচরণ করেছিলেন— তা সব অর্থেই দৃষ্টিকটূ ছিল। আসলে কংগ্রেস ভেবেছিল এই উগ্র বিরোধিতা সংখ্যালঘু মুসলমান ভোটের পুরোটাই তাদের ক্ষমতায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। কিন্তু কংগ্রেস বুঝতে পারেনি ওই মুসলমান সংখ্যালঘু ভোটে অনেক আগেই থাবা বসিয়েছেন লালু, মুলায়ম, মায়াবতীরা। রামমন্দির রায় যদি রাজনৈতিকভাবে বিজেপির বিরুদ্ধে যেত তাহলে অবশ্যই কংগ্রেসের লাভ হতো। কিন্তু রায় বিপক্ষে না যাওয়ায় কংগ্রেস পড়েছে বিপাকে। শাঁখের করাতের মাঝে পড়ে যাওয়া অবস্থা তার। রায়ের খোলাখুলি বিরোধিতাও তারা করতে পারছে না সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সমর্থন হারানোর ভয়ে। আবার খোলাখুলি সমর্থনও করতে পারছে না সংখ্যালঘু মুসলমানদের সমর্থন হারানোর ভয়ে। ফলে, চাঁদ সদাগরের বাঁ-হাতে মনসা পুজো দেওয়ার মতো করে বলতে হচ্ছে, সুপ্রিম কোর্টের রায়কে আমরা মান্যতা দিচ্ছি। শুধু কংগ্রেস নয়। অন্যান্য বিরোধী দলগুলিও সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধাচারণ করেনি। এটাও রাজনৈতিকভাবে বিজেপির আর একটি বড়ো জয়। যারা কিছুদিন আগেও দলবদ্ধভাবে বিজেপির রামমন্দির আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে, তারা যখন আজ সুপ্রিম কোর্টের রায়কে মান্যতা দেওয়ার কথা বলছে, তখন বিজেপি বুঝতেই পারছে, এই মুহূর্ত তাদের বিরোধিতা করার মতো কোনো রাজনৈতিক শক্তিই আর ময়দানে নেই।

অযোধ্যার এই রায়ের পর অতি উৎসাহে এখনই কাশী-মথুরার দিকে হাত বাড়ানো যে খুব একটা কাজের কাজ হবে না, সঙ্ঘ এবং বিজেপি তাও বুঝছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বলেই দিয়েছে, কাশী এবং মথুরাকে কেন্দ্র করে তাদের কোনো কর্মসূচি নেই। একই কথা বিজেপিও বলছে। অযোধ্যার পরপরই যদি অতি উৎসাহীরা কাশী এবং মথুরা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাহলে তার ব্যাখ্যা যে অন্যরকম হতে বাধ্য— তা বিজেপি ও সঙ্ঘ নেতৃত্ব জানেন। সে জন্যই রায়ের পর অযোধ্যায় মন্দির নির্মাণেই মনোনিবেশের ওপর গুরুত্ব দিতে বলছে সঙ্ঘ ও বিজেপি।

রামমন্দির আন্দোলনকে বিজেপি একটি উচ্চতায় পৌঁছে নিয়ে গিয়েছিল— একথা অস্বীকার করা যাবে না। বিজেপি বুঝেছিল, রামমন্দির আসলে ভারতবাসীর অস্মিতার প্রতীক। বিজেপির সাফল্য এখানেই যে, তারা ভারতবাসীর নাড়ির স্পন্দনটি বুঝতে পেরেছিল, যেটা অন্য কেউ পারেনি। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পর রাজনৈতিকভাবে বিজেপির সমর্থন আরও মজবুত হবে এ নিশ্চিত। এবং তার থেকে বিজেপি ফসল তুলবে— তাও নিশ্চিত। আরও একটি কথা না বললেই নয়। শুধু অযোধ্যায় রামমন্দির সংক্রান্ত রায়ই নয়, আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায়ও রাজনৈতিকভাবে বিজেপির পক্ষেই গিয়েছে। রাফাল মামলায় সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার জানিয়েছে, এতে কোনো দুর্নীতি বা বেনিয়মের চিহ্নমাত্র নেই। উপরন্তু কংগ্রেস এবং বিরোধীরা যেভাবে রাফাল প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করেছেন— তাকে ভর্ৎসনা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। চাচা নেহরুর জন্মদিনে এই রায় প্রকাশ করে জাতীয় কংগ্রেসের বালখিল্য নেতা রাহুল গান্ধীকে একটি মোক্ষম চড় কষিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এই দিনই শবরীমালা মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশ সংক্রান্ত মামলাটি পুনর্বিবেচনার জন্য সাত সদস্যের বিশেষ বেঞ্চের কাছে পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আয়াপ্পান গোষ্ঠীর আবেগে আঘাত দিয়ে আগে যে রায় দেওয়া হয়েছিল তাকে এভাবেই সুপ্রিম কোর্ট মান্যতা দেয়নি। সুপ্রিম কোর্টও মনে করেছে ওই রায় যথাযথ হয়নি। তার পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। কেরলে কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করে আয়াপ্পান গোষ্ঠীর পাশে দাঁড়িয়েছিল বিজেপি। তাতে কেরলে বিজেপির জনভিত্তিও ক্রমশ বাড়ছে।

শবরীমালা সংক্রান্ত রায় কেরলে বিজেপিকে আরও শক্তিশালী করবে। আর একথা বলতেই হচ্ছে, সাম্প্রতিক কালের এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রায় প্রমাণ করেছে, বিজেপি ভুল পথে চলেনি। ■

রামজন্মভূমি : ফিনিক্স পাখির মতোই ডানা মেলল প্রকৃত ইতিহাস

সুজিত রায়

৯ অক্টোবর ২০১৯। ভারতবর্ষের হিন্দুত্বের ইতিহাসে সূচিত হলো এক নতুন অধ্যায়। একজন মুসলমান বিচারপতি সহ ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতি টানা ৪০ দিনের শুনানির পর দীর্ঘ বিচারবিবেচনা করে ঘোষণা করেছেন—অযোধ্যার বিতর্কিত জমি রামলালার। অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের। অন্য কারও নয়। কোনো ব্যক্তির নয়, কোনো সংগঠনের নয়, বহিরাগত কোনো ধর্মের নয়। ৫০০ বছর ধরে পূজিত হয়ে আসা ওই জমি শ্রীশ্রীরামলালার—এই ঘোষণা এক অর্থে হিন্দুত্বের দীর্ঘদিনের দাবিরই স্বীকৃতি। আর সেই সঙ্গে সমাপ্তি ঘটল রামমন্দির বনাম বাবরি মসজিদ বিতর্ক তথা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া সংঘাতের। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছেন, বিতর্কিত ২.৭৭ একর জমি রামলালার। কারণ যে রামমন্দিরকে একদিন মুসলমান মোল্লা মৌলভিরা বাবরি মসজিদ আখ্যা দিয়ে দখল করে রাখতে চেয়েছিলেন, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার বিশেষজ্ঞরা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করে রিপোর্ট দাখিল করেছেন যে, বিতর্কিত সৌধের গভীরে যে ভিত বা কাঠামোর সন্ধান পাওয়া গেছে তা কখনোই কোনো ইসলামিক সৌধের কাঠামোর সঙ্গে মেলে না। বরং ওই কাঠামোর অনেক বেশি মিল রয়েছে হিন্দু মন্দিরের ধাঁচের সঙ্গে। সুতরাং সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট রায় ''Muslims can't assert right of adverse possession'। একই সঙ্গে বাতিল হয়ে গেছে শিয়া ওয়াকফ বোর্ডের দাবি যে সৌধটি ছিল বাবরের তৈরি মসজিদ। বাতিল হয়ে গেছে হিন্দু সংগঠন নির্মোহী আখড়ার দাবিও যে তাদের আখড়াই ছিল রামলালার সেবাইত।

> সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আপামর ভারতবাসী স্বাগত জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের আদেশকে। ধ্বংসাবশেষ থেকে উঠে এসেছে বাস্তব ইতিহাস ফিনিক্স পাখির মতোই। তার নাম রামলালা। তার নাম রামজন্মভূমি।

অযোধ্যা জনপদটি মূলত হিন্দু

মনোভাবাপন্ন অঞ্চল তা এলাকায় পা ফেল্লেই স্পষ্ট হয়ে যায়। গোটা জনপদে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অজস্র দেবালয়। অনেকগুলিই প্রাচীনত্বের ভারে হয় ন্যুব্জ অথবা ভেঙে পড়েছে। তাও বেশ কিছু প্রাচীন মন্দির আজও অক্ষত এবং পুজোপাটে প্রাণবন্ত। বাবরি ধাঁচা নিয়ে মুসলমানদের দাবি যতই জোরদার হোক না কেন, আসল ইতিহাস তাই অন্য কথাই বলে। অযোধ্যার লৌকিক ইতিহাস বলেঃ মোগল আমলের বহুপূর্বে রাজা বিক্রমাদিত্য নাকি এখানে সাত শিখরের সুদৃশ্য মন্দির তৈরি করেছিলেন ৮৪টি কষ্টিপাথরের স্তম্ভ সহযোগে। আজও মন্দিরে তার চারটি বর্তমান যাতে হনুমানের মূর্তি খোদাই রয়েছে। তারপর বারবার দেশি বিদেশি আক্রমণ সংঘঠিত হয়েছে এই মন্দিরের ওপর। এমনকী মোগল আমলেও। সে সময়কার লোক-ইতিহাস বলছে, মোগল আমলে মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন শ্যামানন্দ যোগী। তাঁর সঙ্গেই বাস করতেন দুই মুসলমান দরবেশ খাজা আব্বাস ও জালাল শাহ। বাবর মানসিংহের কাছে পরাজিত হয়ে শ্যামানন্দ যোগীর শিষ্য হন এবং সেই সময়ে খাজা আব্বাস ও জালাল শাহের আদেশেই বাবর তার সেনাপতি মির বাকি তাসখান্দিকে দিয়ে রামমন্দিরকে মসজিদের রূপ দেন। শ্যামানন্দ তখন রাজি হয়েছিলেন কয়েকটি শর্তে। তার মধ্যে অন্যতম, মন্দিরের গঠন মসজিদের মতো হলেও এর মধ্যে প্রত্যহ পুজোপাঠ হবে রামলালার। শুধুমাত্র শুক্রবার এখানে মুসলমানরা নামাজ পড়তে পারবেন। সেই ব্যবস্থাই বহাল ছিল বহুদিন।

কিন্তু পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের কায়েমি রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের বিভেদকামী মনোভাব জিগির তোলে রামমন্দির বনাম বাবরি মসজিদ বিতর্কের। সেই বিতর্কের ফলেই একসময় প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে আদালতের নির্দেশে তালা পড়ে মন্দিরে। ফৈজাবাদের আইনজীবী উমেশ পাণ্ডে সম্পূর্ণভাবে আইনি লড়াই লড়ে মন্দিরের তালা খোলান। ১৯৮৪ সালের পর থেকেই শুরু হয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতৃত্বে বহুচর্চিত মন্দির ও সংলগ্ন জমির দাবিদার হিসেবে মন্দির নির্মাণের দাবি। শুরু হয় রামজন্মভূমি মুক্তি আন্দোলনের। যদিও তার অনেক আগেই ১৯৪৯ সালেই শ্রীরামজন্মভূমি সেবা সমিতির তত্ত্বাবধায়ক সন্ত রামদয়াল শরণের পরিচালনায় শুরু হয়েছিল অখণ্ড শ্রীরাম সংকীর্তন। পরে দিগম্বর আখড়ার প্রধান রামচন্দ্র দাসের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে শ্রীরামজন্মভূমির মুক্তির দাবিতে অত্যন্ত জোরদার আন্দোলন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, শ্রীরামজন্মভূমির মুক্তি না হলে, তিনি আন্দোলন করতেও পিছপা হবেন না। ১৯৮৪ সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ লক্ষ্ণৌ শহরে বিশাল সমাবেশে ঘোষণা করে—শুধু রামজন্মভূমিই নয়, গোটা দেশের বহিরাগত আক্রমণকারীদের অধিকৃত ১৪০টি হিন্দু মন্দিরকেই তুলে দিতে হবে হিন্দুদের হাতে। কারণ ভারতবর্ষ মানে হিন্দুত্বের ভূমি। হিন্দুত্ব কোনো ধর্ম নয়। হিন্দুত্ব একটা জীবনচর্যা। পুজোপাঠ সেই চর্যারই অঙ্গ। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সেই তীব্র দাবিরই ফলশ্রুতি হিসাবে আরও একটা ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর। সেদিন ক্ষোভে ফেটে পড়া রামভক্তদের হাতে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল বাবরি ধাঁচা। শুধু একটি প্রতীকী আন্দোলনের নজির রাখতে যে, কলঙ্কের চিহ্ন চিরকাল বহন করা যায় না। কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের অসাবধনাতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সেদিন হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ফলে বহু হিন্দু এবং কিছু মুসলমান মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল ঠিকই কিন্তু ওইদিন একটা বিষয় দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে শ্রীরামলালার সম্মান রক্ষায়, তাঁর লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার দিন শেষ করতে হিন্দুরা বদ্ধপরিকর। গোটা দেশে তো বটেই, বিদেশের মাটিতেও এই নিয়ে কম রাজনৈতিক জলঘোলা হয়নি। সংখ্যালঘু তোষণকারী কংগ্রেস ও বামপন্থী দলগুলি স্লোগানে স্লোগানে ভারতের আকাশ ফাটিয়েছিল এই বলে যে—ভারতবর্ষে গণতন্ত্র শেষ। নেকড়ের মতো এগিয়ে আসছে হিন্দুধর্মের করালগ্রাস।

আজ দীর্ঘ ৫০০ বছরের ইতিহাসের এবং ১৩৪ বছরে আইনি লড়াইয়ের যে পরিণতি হলো—তা প্রমাণ করে, হিন্দুদের দাবি কখনও মিথ্যা ছিল না। প্রমাণিত হলো একথাও যে অযোধ্যার বাবরিধাঁচা ধ্বংসের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার যে ভয়াবহ প্রতিচ্ছবি দেশকে রক্তাক্ত করে তুলেছিল তার পিছনেও ছিল পরিকল্পিত রাজনীতি।

আজ প্রমাণ হয়ে গেছে, সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ড ও আবুদমান মুহাফিজ ও মকবির ১৯৪১ সাল থেকে বাবরি মসজিদের দাবিতে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, তাও ছিল অমূলক ও বিভ্রান্তিকর। ইতিহাস এবং সত্যকে অস্বীকার করে আজীবন একটা গোটা দেশের সাধারণ জীবনচর্যার গতিপথকে বিপথে পরিচালিত করা যায় না। সুপ্রিম কোর্টের রায় তাই শুধু রামলালার পক্ষে নয়, এ রায় মূলত হিন্দুত্বের পক্ষে, যে আদর্শকে আঁকড়ে ধরেই ভারতবর্ষ এগিয়ে চলেছে স্বাভিমানী দেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে। সুপ্রিম কোর্টের রায় অযোধ্যার রামলালার জয়— সেই প্রচেষ্ঠাকেই এগিয়ে দিল আরও কয়েকটা ধাপ।

রামভক্তরা মাঝেমাঝেই স্লোগান তুলতেন 'রামমন্দির ওহি বনায়েঙ্গে'। রামলালা নিজেই তাঁর জমি উদ্ধার করে নিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে মন্দির তৈরি করতে হবে ট্রাস্টের সদস্যদের এবং মন্দিরের নির্মাণকাজ সীমাবদ্ধ রাখতে হবে ২.৭৭ একর জমির মধ্যেই। এখন সরকারের দায়িত্ব তীব্র হিন্দু ভাবাবেগকে প্রাধান্য দিয়ে মন্দির নির্মাণ করে রামলালার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই মুসলমান ধর্মীয় চেতনাকে সম্মান জানিয়ে মসজিদ গড়ে তোলার জন্য পাঁচ একর জমি বরাদ্দ করা। যত দ্রুত এই কাজগুলি করা যাবে সরকারি লাল ফিতের গেরো খুলে, ততই মঙ্গল। হিন্দুরা কখনই হিংস্রতায় বিশ্বাসী নয়। সনাতনী হিন্দুত্ব সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাসী যদিও কখনই তা হিন্দুত্বকে খাটো করে বা বাতিল করে নয়। হিন্দুত্ব জীবনচর্যার সেটাই আদর্শ বলেই সুপ্রিম কোর্ট রায়দানের প্রাক্কালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নির্দেশ জারি করেছিল—আগেভাগেই কেউ যেন কোনও মন্তব্য প্রকাশ করে সামাজিক বন্ধনের আদর্শকে ধূলিসাৎ না করে। ফলত হয়েছেও সেটাই। সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আপামর ভারতবাসী স্বাগত জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের আদেশকে। ধ্বংসাবশেষ থেকে উঠে এসেছে বাস্তব ইতিহাস ফিনিক্স পাখির মতোই। তার নাম রামলালা। তার নাম রামজন্মভূমি। ■

রামমন্দির, পুরুলিয়া।

ভারতীয় ও বঙ্গীয় সংস্কৃতিতে শ্রীরামচন্দ্র স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় সংস্কৃতিতে শ্রীরামচন্দ্র একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। বিভিন্ন হিন্দু পুরাণ অনুসারে বিষ্ণুর দশাবতারের অন্যতম হলেন অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রাম। ফলে রামচন্দ্র অন্যতম হিন্দু দেবতাও। ভারতীয় ঐতিহ্য মানুষের দেবত্বে উত্তীর্ণ হওয়া এবং দেবতার মনুষ্যরূপ ধারণ একটি সাধারণ ঘটনা। ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের অন্যতম রামায়ণের কেন্দ্রীয় চরিত্র এই রামচন্দ্র। যে রামায়ণের ওপর নির্ভর করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন ভাষায় যুগে যুগে রচিত হয়েছে অসংখ্য কাব্য, নাটকসহ অগুনতি সাহিত্য। ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার যেখানেই ঘটেছে সেখানেই শ্রীরামও পৌঁছে গেছেন। তাই সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়াতেই রামচন্দ্রের প্রভাব দেখা যায়।

ভারতীয় জনজীবনে রামচন্দ্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "বাল্মীকির রামচরিত কথাকে কেবলমাত্র কবির কাব্য বলিয়া দেখিবেন না, তাহাকে ভারতবর্ষের রামায়ণ বলিয়া জানিবেন।... ইহার সরল অনুষ্টুপ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বছরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিতেছে।" ভারতবর্ষের সব থেকে বড়ো উৎসব 'দীপাবলী'— যা রামচন্দ্রের লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় ফেরা উপলক্ষ্যে পালিত হয়। 'দশেরা' ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অন্যতম বড়ো উৎসব— যা রামচন্দ্রের লঙ্কাধিপতি রাবণকে পরাজিত করা উপলক্ষ্যে উদ্‌যাপিত হয়। অর্থাৎ শ্রীলঙ্কা থেকে অযোধ্যায় পৌঁছতে শ্রীরামচন্দ্রের সময় লেগেছিল ২১ দিন। মজার কথা হলো যে, আধুনিক প্রযুক্তিও বলছে শ্রীলঙ্কা থেকে

শ্রীরামচন্দ্রের শোভাযাত্রা, রামরাজাতলা, হাওড়া।

রামমন্দির, পাণ্ডবেশ্বর।

পায়ে হেঁটে অযোধ্যা পৌঁছতে কোনো মানুষের প্রায় ২১ দিন লাগতে পারে। উত্তর ভারতের বহু মানুষ পরস্পরকে সম্বোধন করেন 'রাম রাম' বলে। মৃত্যুর পর শোনা যায়— 'রাম নাম সত্য হ্যায়।' এই ভাবে প্রত্যেক ভারতীয়র জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছেন রামচন্দ্র। ভারতীয় সংস্কৃতিতে আদর্শ প্রজানুরঞ্জক, প্রজা কল্যাণকারী রাজ্য— যে রাজ্যে সাধারণ মানুষ সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে তাকে 'রামরাজ্য' বলা হয়ে থাকে। এই 'রামরাজ্য' স্থাপনের কথা গান্ধীজীও বলতেন। অনেকের মতে, গান্ধীজী মৃত্যুর আগের শেষ কথাও ছিল— 'হে রাম।'

এবার আসা যাক আমাদের বঙ্গভূমির দিকে। বাঙ্গালির সবথেকে বড়ো উৎসব শারদীয়া দুর্গাপূজা। আমরা সকলেই জানি শরৎকালে মায়ের অকাল বোধন প্রথম করেছিলেন রামচন্দ্র, তার আগে মূলত পূজা হতো বসন্তকালে। এই অনুযায়ীই আজও বাঙ্গালি শরৎকালে মাতৃ আরাধনা করে চলেছে। বাঙ্গালি শিশুদের আজও শেখানো হয় ভূতের ভয় পেলে বলতে— ''ভূত আমার পুত, পেত্নি আমার ঝি/রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে, ভয়টা আমার কী?'' হাওড়ার রামরাজাতলা, হুগলীর শ্রীরামপুর-সহ গোটা বাঙ্গলা জুড়ে অসংখ্য স্থান রামের সঙ্গে (মূলত রামনগর, রামপুর ইত্যাদি) সম্পর্ক রয়েছে। এবার আমরা যদি বঙ্গের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের দিকে নজর দিই তাহলে সেখানেও রামের প্রবল উপস্থিতি লক্ষ্য করব। বাংলায় রচিত সংস্কৃত সাহিত্যগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হলো সন্ধ্যাকর নন্দীর লেখা 'রামচরিত'। পাল বংশীয় রাজা রাম পালের সভাকবি ছিলেন সন্ধ্যাকর নন্দী। এই 'রামচরিত' কাব্য হলো একটি দ্ব্যর্থবোধক কাব্য— অর্থাৎ এখানে একই সঙ্গে তিনি রামচন্দ্রের কৃতিত্ব বর্ণনার আড়ালে পাল বংশীয় নৃপতি রাম পালের নানা কীর্তি-কাহিনির বর্ণনা করেছেন। মধ্যযুগে বাঙ্গলায় কৃত্তিবাস ওঝা 'শ্রীরাম পাঁচালি' রচনা করেন— এই কৃত্তিবাসী রামায়ণ আজও বাঙ্গালির ঘরে ঘরে পঠিত হয়। ৫১টি শক্তিপীঠের অন্যতম হলো— বীরভূমের লাভপুরের ফুল্লরা দেবীর মন্দির। সতীর অধর (নীচের ঠোঁট) এখানে পড়েছিল। বিশ্বাস যে, মন্দিরের পাশের বড়ো পুষ্করিণী থেকেই হনুমান রামচন্দ্রের জন্য ১০৮টি নীল পদ্ম সংগ্রহ করেন— যা দেবী দুর্গার পূজার জন্য তাঁর প্রয়োজন ছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরিবারের উপাস্য দেবতা ছিলেন শ্রীরাম। তাই পরিবারের তিন পুত্রের নামই শুরু হয় রাম দিয়ে। রানি রাসমণি দেবীর পরিবারের কুলদেবতাও ছিলেন রঘুবীর— যা আদতে রঘু বংশীয় বীর রামচন্দ্রকেই বোঝাচ্ছে। সুকুমার সেন দেখাচ্ছেন যে, রামচন্দ্রকে নিয়ে— ''রসঘন রাম। নব দুর্বাদল শ্যাম।'' বিশিষ্ট ক্ষেত্র সমীক্ষক ও লোকসংস্কৃতিবিদ ড. স্বপন কুমার ঠাকুর তাঁর বিভিন্ন লেখায় বঙ্গীয় সংস্কৃতির সঙ্গে রামচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, বাঙ্গলার বৈষ্ণব সংস্কৃতির ধারায় রামের অস্তিত্ব বিরাজমান। অন্যতম চৈতন্য জীবনীকার দয়ানন্দের নিজের পরিবার ছিল রামচন্দ্রের পরিবার। চৈতন্যদেবের বন্ধু মুরারী গুপ্ত নিজে ছিলেন রামভক্ত। রাঢ় বাঙ্গলার অন্যতম দেবতা হলেন ধর্মরাজ। এই ধর্মরাজপালায় বহু জায়গায় রামায়ণের গান হয়। এছাড়াও বাঙ্গলায় প্রচুর পরিমাণে টেম্পল কয়েন পাওয়া গেছে রামচন্দ্রকেন্দ্রিক। পঞ্চদশ-অষ্টাদশ শতকের এইসব মুদ্রা রাঢ় বাঙ্গলার মাটির তলা থেকেই পাওয়া গেছে। স্বপন কুমার ঠাকুর দেখিয়েছেন, বাঙ্গলার বিভিন্ন বিশেষত শুধুমাত্র কাটোয়া মহকুমাতেই প্রায় ২০টি প্রাচীন রামচন্দ্রের বিগ্রহ আছে। —এতকিছুর পরেও যাঁদের মনে হয় যে রামচন্দ্র বঙ্গীয় সংস্কৃতির অংশ নয়— তাঁদের হয় বাঙ্গালি সংস্কৃতির সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই, নচেৎ তাঁরা জেনে বুঝে মিথ্যাচার করছেন।

আমরা জানি যে মধ্যযুগে বহিরাগত আক্রমণকারীদের দ্বারা হাজার হাজার হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং বহু জায়গাতেই পুরনো মন্দিরের ওপরেই মসজিদ নির্মিত হয়। ভারতবর্ষে মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের নির্দেশে তাঁর সেনাপতি মির বাকি রাম জন্মভূমি অযোধ্যায় রামচন্দ্র সম্পর্কিত সমস্ত মন্দির ধ্বংস করে ১৫২৮-এ একটি মসজিদ স্থাপন করেন। এই মসজিদটি বাবরি মসজিদ নামে বেশি পরিচিত, কিন্তু ১৯৪০-এর দশকের আগে এটি পরিচিত ছিল 'মসজিদ-ই-জন্মস্থান' নামে। মসজিদটি একটি ছোটো টিলার ওপর অবস্থিত— যার নাম 'রামকোট' (রামের দুর্গ)।

ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (এএসআই)-এর প্রাক্তন রিজিওনাল ডিরেক্টর (উত্তর) ও সুপারিন্টেনডেন্ট আর্কিওলজিস্ট প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ কে. কে. মুহাম্মদের নেতৃত্বে একটি দল অযোধ্যার বিতর্কিত জায়গায় উৎখনন চালিয়ে মসজিদের তলায় পুরনো স্থাপত্যের হদিস পান। মুহাম্মদ ২০১৬-তে মালায়লম ভাষায় প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনীতে (যার বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায় 'আমি একজন ভারতীয়') লেখেন যে, মার্কসবাদী ইতিহাসবিদরা কট্টরপন্থী মুসলমান গোষ্ঠীগুলিকে সমর্থন করায় অযোধ্যা বিতর্কের গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছনো কঠিন হয়ে পড়ে। মুহাম্মদ এই বইয়ে দাবি করেছেন, অযোধ্যায় হওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে মসজিদের তলায় মন্দির থাকার পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া গেছে, কিন্তু বামপন্থী ইতিহাসবিদরা একে অস্বীকার করে এলাহাবাদ হাইকোর্টকে ভুল পথে চালানোর চেষ্টা করে। ২০০৩-এ 'ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ' এলাহাবাদ হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা দেয় যে, মসজিদের নীচে খ্রিস্টিয় দশম শতকের একটি স্থাপত্য রয়েছে। এবং ওই অঞ্চলটিতে অন্তত ৩৩০০ বছর আগে থেকে মানুষ বসবাস করত। এবং অন্তত ১০০০ বছরের পুরনো স্থাপত্যের ওপর এই মসজিদটি খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে তৈরি করা হয়। ২০১০-এ তার রায়ে এলাহাবাদ হাইকোর্ট আইএসআই-এর এই সন্ধানকে মান্যতা দিয়ে মেনে নেয় যে, ওই জায়গাটিতে একটি বৃহদাকার হিন্দু ধর্মীয় স্থাপত্য ছিল।

অযোধ্যায় বিবদমান জায়গাটি বিগত কয়েক শতক ধরে অসংখ্য সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ করেছে। ঊনবিংশ শতকেও ব্রিটিশ কোর্টে ওই জায়গাটির দখল নিয়ে মামলা চলে। স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন আদালত এই নিয়ে মামলা চলছে। শিয়া ওয়াকফ বোর্ড ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে যে, রামজন্মভূমিতে রামমন্দির নির্মিত হলে তাদের কোনো আপত্তি নেই। তা সত্ত্বেও অনেক ওজর আপত্তি এবং ৪০ দিন শুনানির পর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ গত ৯ নভেম্বর রামজন্মভূমির পক্ষে রায় দিয়েছেন। মিটে গেল কয়েক শত বছরের বিতর্ক। ভারতবর্ষে সুপ্রিম কোর্টের রায় সমস্ত গণতন্ত্রপ্রেমী সুনাগরিক মাথা পেতে মেনে নিলেন। ভারতবর্ষে পুনরায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলেন শ্রীরাম। ■

মতামত

জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত আধুনিক ভারতের নতুন প্রজন্ম দেশদ্রোহীদের ক্ষমা করবে না

কে. এন. মণ্ডল

ভূস্বর্গে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিদের হাতে কাশ্মীরিয়তের গর্বিতরা পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় সুরক্ষা বলয়ের কর্মী, এমনকী সাংবাদিক নিধনেও যারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রশ্ন তোলেন না, বরং কাশ্মীর উপত্যকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী পাঠানোর কঠোর সমালোচক, তাঁরাই শ্রীনগরের ৫৩ কিলোমিটার দূরে কুলগ্রামে ৫ জন বাঙ্গালি মুসলমান শ্রমিকের হত্যায় নিরাপত্তা বাহিনীর অপ্রতুলতার প্রশ্ন তুলেছেন। এই প্রশ্নকর্তা-কর্ত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ একধাপ এগিয়ে এই হত্যাকাণ্ডকে পরিকল্পিত (পড়ুন কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা) আখ্যা দিয়ে তদন্তের দাবি তুলেছেন। ৩৭০ ধারা বিলোপের পরে গত ৩ মাসে কাশ্মীরিদের দুঃখ-দুর্দশা এবং টেলিফোন ব্যবস্থা বা ইন্টারনেট ব্যবস্থা অচল থাকায় মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে যে সমস্ত ব্যক্তি এবং সংবাদমাধ্যম কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করছেন, তারা কিন্তু একবারও বলছেন না যে এই সময়ের মধ্যে বিক্ষোভ সামলাতে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সামান্য সংঘর্ষ হলেও, কোনো প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এই ৫ জন শ্রমিকের নৃশংস হত্যা উগ্রবাদীদের নগ্ন কাপুরুষতার পরিচায়ক এবং নিন্দনীয়। এই হত্যাকাণ্ডে কাশ্মীরের নিরাপত্তার বজ্র আঁটুনির ফাঁকফোঁকর যেমন বেআব্রু হয়েছে, তেমনি ভ্রমণরত ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের সদস্যদের কাছেও কাশ্মীর বিষয়ে একটি ভুল সঙ্কেত গেল। আর এটাই ছিল এই হত্যা রহস্যের উদ্দেশ্য বা মোটিভ। অথচ এক শ্রেণীর রাজনীতিক ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির স্বার্থে মুর্শিদাবাদের বহালনগরের সদ্য পরিজনহারাদের আবেগকে কাজে লাগিয়ে একপ্রস্থ মোদী নিন্দা এবং কৌশলে ৩৭০ ধারার বিরোধিতার যেমন সুযোগ নিচ্ছেন, আবার অন্যদিকে বিদেশি সাংসদদের নিরাপত্তা দেওয়া গেলে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের নিরাপত্তা কেন দেওয়া গেল না এ ধরনের ছেঁদো প্রশ্ন তুলেছেন। অথচ ওই সমস্ত ব্যক্তিই জেড প্লাস/মাইনাস নিরাপত্তা নিয়ে ঘুরে বেড়ান, অথচ প্রতিদিন পশ্চিমবঙ্গের কোথাও না কোথাও কেউ খুন হচ্ছেন, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটছে— ধর্ষিতা হচ্ছেন মা ও বোনেরা— তাদের নিরাপত্তা নিয়ে একটিও বাক্য ব্যয় করছেন না এঁরা। এই দ্বিচারিতা সাধারণের দৃষ্টি এড়ায় না।

কাশ্মীরে নিরাপরাধ ব্যক্তিদের হত্যা, বন্ধ, কারফিউ, ১৪৪ ধারা মাসের পর মাস জনজীবন ব্যাহত হওয়ার ঘটনা দশকের পর দশক ধরে চলছে এবং কাশ্মীরবাসীর এটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। যা নতুন তা হচ্ছে ৩৭০ ধারা বিলোপের বিরোধিতায় পাকিস্তানের মদতপুষ্ট ব্যক্তি বা সংগঠন এবং সংবাদমাধ্যমের একাংশের দ্বারা তাদের দুর্দশার অতিরঞ্জন। একথা ঠিক টেলিফোন ব্যবস্থা জ্যাম করায় আত্মজনের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যাহত হয়েছে তা থেকে অনেকে চিন্তাগ্রস্ত এবং ম্রিয়মান। কাশ্মীরের উগ্রপন্থীদের যোগাযোগ ব্যবস্থা (Communication network) বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা। মূল স্রোতের কাশ্মীরিরা এটুকু কষ্ট মেনে নিলে সকলেরই লাভ। কাশ্মীরের বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হলেই ধীরে ধীরে সব নিষেধাজ্ঞাই উঠে যাবে এবং ইতিমধ্যেই প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে অনেকটাই। কাশ্মীরে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের যে বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে, মাসের পর মাস দার্জিলিঙে ইন্টারনেট বন্ধ করতে গিয়ে তার ছিঁটেফোঁটাও তো দেখা যায় না? অথচ দার্জিলিঙে কিন্তু কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হয়নি। কেন্দ্রীয় বাহিনী কাশ্মীরে নির্বিচারে গণহত্যা, অত্যাচার, বলাৎকার চালাচ্ছে বলে এক ধরনের রাজনীতিক এবং প্রচারমাধ্যম যে অপপ্রচার চালাচ্ছে পাকিস্তানি প্রভুদের খুশি করতে এবং মুসলমান ভোটব্যাঙ্কের অঙ্ক কষে— তার দ্বারা বাকিদের বিভ্রান্ত করা গেলেও কিন্তু কাশ্মীরিরা তা বিশ্বাস করে না। কারণ তারা ভালোই জানে কাশ্মীরে আক্রান্ত কাশ্মীরি মুসলমান ছাড়া অন্যান্যরা দু' একটি ব্যতিক্রম। আর এরকম একটি ব্যতিক্রম ঘটে গেল বহালনগরের (কাতরাসু) ৫ জন মুসলমান শ্রমিক হত্যায়, যা জেহাদি আন্দোলনের পরিপন্থী। আর সে কারণেই কাশ্মীরের কুলগ্রামের বর্ষীয়ানদের আক্ষেপ 'কাশ্মীরিয়তে কালো দাগ লেগে গেল'। এর আগেও পঞ্জাব, ছত্তিশগড়-সহ বিক্ষিপ্তভাবে অমুসলমান বহিরাগতদের খতম করা হয়েছে, তখন কিন্তু এ ধরনের আপশোস শোনা যায়নি।

প্রসঙ্গত, এই হত্যাকাণ্ডের দু'দিন আগেই কাশ্মীর থেকে ফিরেছেন নিহত নইমুদ্দিনের পিতা। তিনি জানিয়েছেন বেশ কয়েকদিন থেকেই আপেল বাগানে কর্মরত বহিরাগতদের কাশ্মীর ছাড়ার হুমকি দিয়েছে উগ্রবাদীরা। কিন্তু ওই হুমকি যে এভাবে কার্যকর হবে তা ভাবতে পারেনি কেউ, এমনকী বাগান মালিকেরাও আশঙ্কিত ছিল শ্রমিকদের নিয়ে। কিন্তু তা যে গণহত্যার রূপ নেবে তারাও ভাবেনি, অঙ্ক মিলছে না দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তা বাহিনীরও।

> **পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বর্তমান তিক্ততা থেকে যদি কোনো বৃহৎ যুদ্ধের রূপ নেয় তখন সন্দেহাতীতভাবে ইউরোপের সমর্থন আমাদের জন্য মূল্যবান হবে। সুতরাং ভারতের স্বার্থে ইউরোপিয়ান সদস্যদের যথোপযুক্ত নিরাপত্তা এবং আতিথ্য ভারতের জাতীয় স্বার্থে— এর বিরোধিতা করার অর্থ দেশদ্রোহিতা।**

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের আগমন উপলক্ষ্যে উগ্ররা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করবে আক্রমণ হানার তা জানা থাকলেও এ ধরনের soft target করে উগ্রপন্থীরা কাপুরুতার পরিচয় দেবে তা ভাবতে পারেনি তারা। একথা ভুললে চলবে না কাশ্মীরের এই সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা বাহিনী সদা প্রস্তুত শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং একটিও জীবনহানির ঘটনা যাতে না ঘটে সে বিষয়ে। এ রকম পরিস্থিতিতে যে রাজনীতির কারবারিরা এই হত্যালীলাকে সরকারি পরিকল্পিত হত্যার রূপ দেওয়ার ইঙ্গিত দেয় তারা নোংরা রাজনীতির ধারক ও বাহক এবং দেশের পক্ষে বিপজ্জনক।

বহিরাগতদের উপর হামলার ঘটনা এর আগেও ঘটেছে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে— মেঘালয়, অসম, চেন্নাই ও মহারাষ্ট্রে। বাঁকুড়ার হেমন্ত রায়, ডোমজুড়ের ঠাকুরদাস মাঝি নিহত হয়েছেন কেরল ও দিল্লিতে। এসবই হচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা জনিত এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের এতে নিশ্চয়ই দায় থাকে— শাসক যাঁরা বা যে দলেরই থাকুক। রাজনৈতিক দলগুলি এবং প্রচারমাধ্যম নিশ্চয়ই এ নিয়ে সমালোচনা করবে— কিন্তু সংশ্লিষ্ট সরকার পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে এ বক্তব্য সত্যের অপলাপ। আর একটি বিষয় রাজ্যবাসীর চোখ এড়ায় না। হচ্ছে এই, দুর্ভাগ্যজনকভাবে হত্যাকাণ্ডের বলি একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক হলে ঘটনার তড়িৎ মোড় নেয়। যেমনটি ঘটেছিল মালদার আফরাজুলের ক্ষেত্রে, আবার ঘটলো এখন। নিহতদের পাশে দাঁড়ানো যেকোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের অবশ্য কর্তব্য। প্রয়োজনে রাজকোষ থেকে অর্থ সাহায্য এবং অন্যান্য সাহায্য দেওয়া চলে। তাই বলে শোকাকুল পরিবেশে আত্মীয় পরিজনদের সামনে আমাদের নেত্রী অমুকের মাধ্যমে সাহায্যের চেক পাঠাচ্ছেন এ ঘোষণায় ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির গন্ধ টের পাওয়া যায়। সরকারি টাকায় এই সাহায্য, জনসাধারণের করের টাকায় সাহায্য, সুতরাং নেতা-নেত্রীদের নাম না ভাঙিয়ে প্রশাসনের মাধ্যমে ওই অর্থ বিলি করলেই শোভনীয়তা বজায় থাকতো।

এ প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ। শ্রমিকদের ভিন রাজ্যে যেতে হয় কেন? এই বিষয়টির দুটি দিক আছে— ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে ভারতীয় অধিবাসীরা ব্যবসা বাণিজ্য এবং কাজকর্মের জন্য ভারতের যে কোনো জায়গায় যাওয়া ও থাকার অধিকার আছে। সেখানে তাদের নিরাপত্তার দিকটি সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের আওতায়। সুতরাং কাশ্মীরে কাজের জন্য কেউ যেতেই পারেন। তবে শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলা থেকেই লক্ষাধিক শ্রমিকের শুধু কাশ্মীরে কাজে যাওয়ার খবরটি কিন্তু ওই জেলার দারিদ্র্য এবং কর্মহীনতার বা কাজের সুযোগহীনতার দিকটি প্রকটিত করে। পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানা যা ছিল তা হয় বন্ধ, না হয় অধিকাংশই অন্য রাজ্যমুখী। শিল্পমেলায় কোটি কোটি টাকা খরচ করে শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছুই না পাওয়ায়— বিশ্ব বাংলা শিল্পমেলা (Business Summit) বন্ধ রাখা হয়েছে। দুর্জনেরা বলেন পশ্চিমবঙ্গের শিল্প এখন শব্দ বাজি এবং বোমা তৈরি, আর ব্যবসা হচ্ছে মদের দোকানের নতুন নতুন লাইসেন্স। কিছুদিন আগেই রাজ্যে কয়েক হাজার কোটি টাকা আবগারি শুল্কে আয়ের খবর ছিল দৈনিকে। পাড়ায় পাড়ায় আইনি-বেআইনি মদ ব্যবসার রমরমা। কেউ কেউ উৎপাতে বাড়ি বিক্রি করে অন্যত্র চলে যাওয়ার কথা বলছেন। মাদক দ্রব্যের প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে হত্যা করা হচ্ছে। ক্লাবের টাকায়, আর পূজার টাকায় ভালোই আমদানি। চাকুরি নেই, সুতরাং মদই ভরসা। বিহারের মতো চোলাই খাওয়া রাজ্যেও মদ নিষিদ্ধ করা হয়, আর বাঙ্গলায় তা কোষাগারের ভিত। এই প্রতিবেদকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে হাজার হাজার মানুষ চেন্নাই-হায়দরাবাদে শ্রমিকের কাজ করতে যাওয়ায় অনেক গ্রাম পুরুষশূন্য। রাজ্যের ভিতরে কর্মসংস্থানের পরিকাঠামো তৈরি করতে পারলে অনেককেই বাইরে গিয়ে মরতে হতো না। প্রশ্ন উঠছে, আপাত-শান্ত কাশ্মীরে এই সংগঠিত হত্যাকাণ্ড কেন ঘটলো? এর পরিপ্রেক্ষিত আগেই বলা হয়েছে। কোণঠাসা জঙ্গিরা নিরাপত্তা বাহিনীর তাড়া খেয়ে যখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে তখনই খবর ছড়াল ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের এমপিদের আগমনের। কিছু করে দেখানোর নেশায় আত্মঘাতী গোল করে বসলো। তাই সমালোচনার ভয়ে বা মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়ে এই হত্যার দায় পর্যন্ত স্বীকার করছে না। পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জঙ্গি ২০১৬-তে ১৫ জন অসামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। ২০১৭-তে ৩৪২টি উগ্রপন্থী হানায় ৪০ জন সাধারণের প্রাণ নিয়েছে। এছাড়াও কর্মরত পুলিশ ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর শতাধিক কর্মীকে হত্যা করেছে। তবে এসকল ছিল জেহাদের অঙ্গ— এবারই তার ব্যতিক্রম ঘটেছে বলে কাশ্মীরিয়তে ধাক্কা লেগেছে। এই ধরনের মানসিকতার জন্যই ৩৭০ ধারা বলবৎ থাকা সত্ত্বেও কাশ্মীরে শান্তি ফেরেনি। হয়নি কাশ্মীরবাসীর সামাজিক বা আর্থিক উন্নয়ন। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে ভারতের মোদী সরকার কাশ্মীরিদের উন্নয়নের বাধা ৩৭০ ধারা বিলোপ করেছে রাজ্যটিকে ভারতের মূলস্রোতে ফেরাতে।

ভাবুন তো বিরোধী পক্ষ কত দেউলিয়া এবং নির্লজ্জ হলে ইউরোপিয়ান সদস্যদের নিরাপত্তা প্রদানের সঙ্গে কাশ্মীরে কর্মরত বহিরাগত শ্রমিকদের হত্যাকাণ্ডের তুলনা টানতে পারে। ভারত সরকার আন্তর্জাতিক মহলের সমর্থন লাভের আশায় ওই সদস্যদের ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছে এবং এই পর্যটন রাজনৈতিক তাতে সন্দেহ নেই। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বর্তমান তিক্ততা থেকে যদি কোনো বৃহৎ যুদ্ধের রূপ নেয় তখন সন্দেহাতীতভাবে ইউরোপের সমর্থন আমাদের জন্য মূল্যবান হবে। সুতরাং ভারতের স্বার্থে ইউরোপিয়ান সদস্যদের যথোপযুক্ত নিরাপত্তা এবং আতিথ্য ভারতের জাতীয় স্বার্থে— এর বিরোধিতা করার অর্থ দেশদ্রোহিতা।

আর একটি বিষয় পরিস্কার হওয়া দরকার। ভারতে কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তি হয়েছে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা আইনের ধারা মেনে, যে আইনটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাশ হয়েছে। সুতরাং ২৬ অক্টোবর ১৯৪৭ সালে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি পাকিস্তানে ১৩টি অঙ্গরাজ্যের (Princely States) যোগদানের মতোই। এটা একটি settled fact আর যা unsettled তা হচ্ছে অধিকৃত কাশ্মীরকে উদ্ধার করে কাশ্মীরকে পুরনো মর্যাদায় ফিরিয়ে দেওয়া। ১ নভেম্বর থেকে জম্মু কাশ্মীর এবং লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে প্রতিশ্রুত কেন্দ্রীয় সরকার। পাকিস্তান ভারত বৈরিতা ত্যাগ করলে প্রতিবেশী দুটি দেশই সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে আরও বিকাশ লাভে সমর্থ হবে। অপরপক্ষে ভারতের অভ্যন্তরে ভারতবিরোধী উগ্রপন্থার মদতকারীরা এখনও সতর্ক হলে তাদের এবং দেশের জন্য মঙ্গল। তা না হলে জাতীয়তাবাদী মন্ত্রে দীক্ষিত আধুনিক ভারতের নতুন প্রজন্ম দেশদ্রোহীদের ক্ষমা করবে না।

(লেখক ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য প্রবন্ধক)

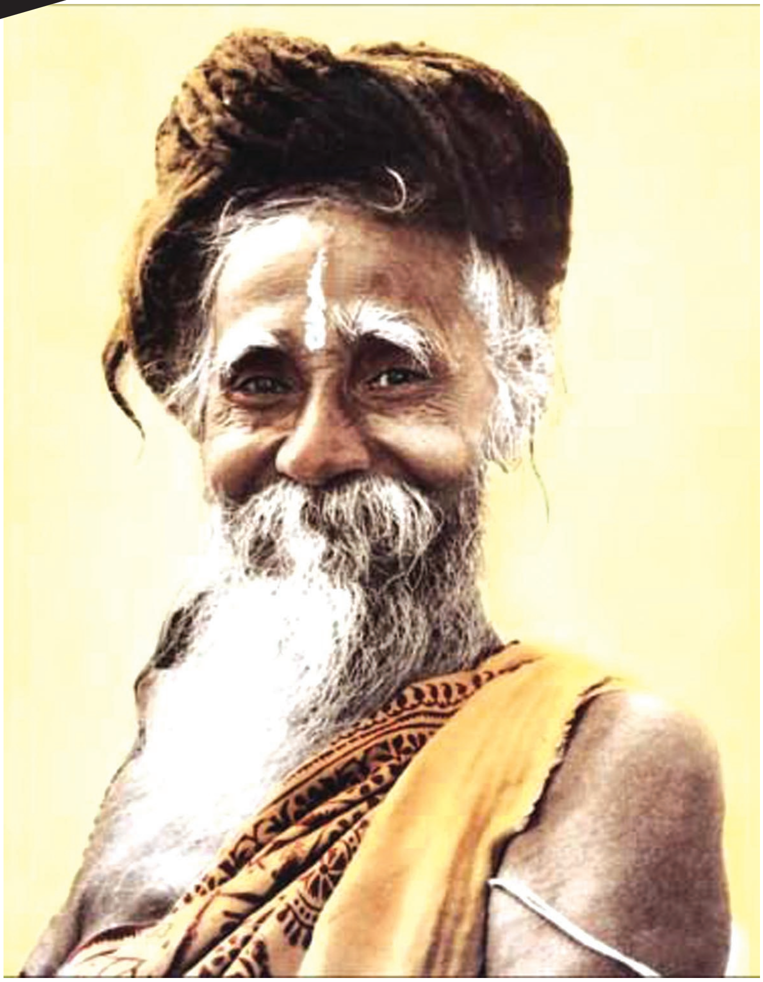

শ্রীশ্রী সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ দেবের ভক্তদের আজ বড়ো সুখের দিন

সারদা সরকার

"তোমার জন্মভূমি উদ্ধারের তরে বহু বহু বর্ষ ধরি তব
ভক্ত গণ
সীতারাম নাম সদা করে প্রেম ভরে সত্বর তাদের করো
অভীষ্ট পূরণ।"

দেশবিদেশ জুড়ে সীতারামদাস ওঙ্কারনাথের লক্ষ লক্ষ ভক্ত ত্রৈকালিক আরাধনায় রামজন্মভূমি উদ্ধারের জন্যে প্রার্থনা করে এসেছে বহু বহু বছর। এতদিন পরে তাদের সেই আশা পূরণ হলো। আজ যে বড়ো উৎসবের দিন। প্রাণের ঠাকুরটি আজ স্থূলদেহে উপস্থিত থাকলে কী হতো সেটা ভেবে শিহরিত হই।

প্রতিটি শিষ্যের কাছে দীক্ষাদানের দক্ষিণা হিসেবে চেয়ে নিতেন চার লক্ষ— না না ত্যাগী শীর্ণকায় যোগীবর মানুষটি টাকা পয়সা কিছুই নিতেন না। এমনকী দীক্ষাদানের দক্ষিণা বাবদ ফল হিসেবে একটি হরতুকী আর বস্ত্র হিসেবে একটি উপবীত দিতে হতো। চার লক্ষ রামনাম লেখা না দিলে দীক্ষা সমাপন হতো না। শিশুকাল থেকে মা ঠাকুমাকে রামনাম লিখতে দেখে বড়ো হওয়া ভক্ত পরিবারগুলিতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অনায়াসে ঢুকে পড়েছিলেন। সেই সব কোটি কোটি চার লক্ষ রামনামের বুঝি আজ সমাপন হলো। ডুমুরদহ রামাশ্রম-সহ বিভিন্ন আশ্রমে আজও থরে থরে এই খাতাগুলি পাওয়া যাবে। মঠ থেকে বিনামূল্যে অথবা নামমাত্র মূল্যে খাতাগুলি দেওয়া হতো শুধু রামনাম লেখার জন্য। কুঁড়েঘর থেকে হিথরো এয়ারপোর্ট অবধি এই রামনাম খাতার অবাধ যাতায়াত। ঠাকুর বলতেন তুমি যখন লিখছ তখন তোমার মনে শ্রীরামের স্মরণ, মুখে মৌন উচ্চারণ, হাতে নামের স্পর্শ— সমস্ত প্রধান ইন্দ্রিয়গুলি একমুখী হয়ে উঠছে। স্মরণ মননের এর চেয়ে আর বড়ো উপায় কী আছে। এখন মনে হয় তখনকার সাধারণ ঘরের আটপৌরে মায়েরা মেয়েরা হয়তো অক্ষর পরিচয়ও করে নিতেন এই রামনাম লেখার মধ্যে দিয়েই, কে বলতে পারে?

চুঁচুড়ার দুর্গাদেবীর মা, 'ভুদেব ভবন'-এ ভাড়া থাকাকালীন প্রায়ই স্বপ্ন দেখতেন— এক জটাধারী সাধু গঙ্গার ওপর থেকে হাত বাড়িয়ে ডাকছেন...। পরে ঘটনাক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে এলে তাঁকেই স্বপ্নদৃষ্ট সাধু বলে চিনতে পারেন এবং বহু পরে তার দীক্ষা হয়...। চোখে গ্লুকোমার কারণে সে জন্মে আর গুরুদক্ষিণা স্বরূপ চার লক্ষ রাম নাম লিখে শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন থেকে তিনি বঞ্চিত হন। তার মৃত্যুর পর বহু বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে দুর্গাদেবীর কন্যা চিত্রার এক কন্যা সন্তান হয়েছে। ছোটোবেলা থেকেই সে সীতারামের ছবি নিয়ে খেলা করে। একদা চন্দননগরে সুশীল সামন্তের বাড়ি দুর্গাদেবী নাতনীকে নিয়ে এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনে। সেখানে অত ভিড়ের মধ্যে সীতারাম হঠাৎ ডাকলেন সেই বালিকাকে। নিজের বিছানার তলা থেকে একটি হরিতকী তার হাতে দিয়ে বলে উঠলেন, "চার লক্ষ রাম নাম লিখে ফেরত দিবি"। সামনে

দণ্ডায়মান দিদিমা প্রতিবাদ করে বললেন— ''ও তো আপনার শিষ্যা নয়, ও কেন চার লক্ষ রামনাম লিখবে?'' ঠাকুরের উত্তর এল, ''তোদের সে চোখ আছে যে তোরা দেখতে পাবি? ওর আগের জন্মের দক্ষিণা বাকি আছে, সেটাও এ জন্মে শোধ করবে।

সীতরামদাস ওঙ্কারনাথের ইষ্টমন্ত্র ছিল রাম। তাই স্বাভাবিক ভাবে তিনি ছিলেন রামবাহক, রামধারক, শ্রীরাম সারথি। তাঁর লেখা ত্রৈকালিক স্তবমালায় রামগান ভক্তদের নিত্যদিনের গান ছিল। তিলক কামোদ রাগে নিজেই সুরারোপ করেছিলেন। বড়ো মধুর সে রামায়ণী গান। সব কথার যে মানে বুঝেছি তা নয়, তবে গাইতে গাইতে কখন সে গান শিরা উপশিরায় বইতে শুরু করেছে তা অজানা। কঠিন সংস্কৃত তৎসম শব্দগুলি শিশুমনে দাগ কেটেছিল 'প্রণবান্তর্গত সীতারাম'— অর্থাৎ ওঙ্কারচিহ্নের মধ্যে যে শ্রীরাম-সীতা অবস্থান করতেন তাঁকে প্রতি শিষ্যের প্রাণের মানুষ করে তুলেছিলেন ঠাকুর।

ঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ তখন এক বছরের শিশু। দিব্য শিশুকে কোলে নিয়ে তাঁর দিদিমা অষ্টপ্রহর হরিনামে বসেছিলেন। হঠাৎ দেখা গেল— শিশু অজ্ঞান! সকলের আশঙ্কা দূর করে অভিজ্ঞ মূল গায়েন বললেন— 'তোমার ছেলের তড়কা হয়নি মা, নাম শুনতে শুনতে সমাধি হয়েছে। এ সমাধি লক্ষণ। ছেলেকে আর কেউ ছুঁয়ো না। আমাকে একটু গঙ্গাজল দাও।' গঙ্গাজল ছিটিয়ে কয়েকবার 'রাম' নাম করতেই শিশু তার পদ্মপলাশ নয়ন মেলে সকলকে আশ্বস্ত করল! মূল গায়েন পুনরায় বললেন— ''যখন ঠাকুর দেবতার কথা হবে, তখনই এরূপ হতে পারে। এ ছেলে সামান্য নয়! যখনই এইরূপ হবে, তখনি কেউ না ছুঁয়ে কাছে বসে রাম রাম করবে। তাহলেই ভালো হয়ে যাবে।'' এই প্রসঙ্গে মাধব ঠাকুর বলেছেন— ''তার পরবর্তী যুগ সেই মূল গায়েনের কথার সত্যতা ঘোষণা করেছে।'' অর্থাৎ অবতারলীলার বৈশিষ্ট্যরূপ 'মুহুর্মুহু সমাধি' সীতারামের লীলায় বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের কাছে একবার প্রবোধ মিত্র নামক জনৈক ভক্ত কৃপা যাচনা করলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বললেন— ''যদি দীক্ষা নাও, রোজ জপ করতে পারবে?'' প্রবোধ মিত্র বলল— ''না না না! তামার পাত্রটাত্র দেখলেই আমার বিরক্ত লাগে। আমি জপ করতে পারব না।'' ঠাকুর বললেন— ''তাহলে এখানে এসেছ কেন? তুমিই বল তুমি কী করতে পারবে?'' প্রবোধ মিত্র বলল— ''আমি রাম নাম লিখতে পারব''। ঠাকুর বললেন— ''বেশ বেশ! তাতেই হবে। এই কথা মতো তুমি নাম লিখবে।'' এর পর থেকে এই প্রবোধ মিত্র প্রত্যহ ৯ ঘণ্টা ধরে 'শ্রীরাম রাম রাম' লিখতে লাগল। ক্রমে তার সব আলস্য ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। সে অন্তর থেকে পরিবর্তিত হলো, শুধুমাত্র রামনাম লিখেই নাদ জ্যোতি লাভ করল। তার দিব্য অনুভূতির কথা শুনে ঠাকুর তাকে খুব প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ করে বলতেন— ''সাবাস বেটা! চালিয়ে যা!'' শ্রীশ্রী ঠাকুর বলেছেন— ''যাঁহারা সর্বদা 'শ্রীরাম রাম রাম' বলেন, তাঁহাদের ভোগ ও মোক্ষ লাভ হয়, এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। নিত্য নিয়মিত 'শ্রীরাম রাম রাম' নাম যত্নপূর্বক শুদ্ধভাবে লিখিলে রোগী রোগমুক্ত হইবে, ভোগী তার অভিলাষিত ভোগ লাভ করবেই করিবে।'' 'শ্রীরাম-রাম-রামেতি যে বদন্ত্যপি সর্ব্বদা। স্তেযাং ভুক্তিশ্চ মুক্তিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। লিখেছেন ''ওরে আমার স্বরূপহারা জীব! তুমিই তো রাম। তোমার ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী সীতাকে ইন্দ্রিয়রূপ দশমুখবিশিষ্ট রাবণ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। বিনা শক্তিসাধনায় কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্যরূপ রাক্ষসগণ ধ্বংস হইবে না... মন-রাবণ মরিবে না। মন-রাবণ না মরিলে 'সা ব্রহ্মবিদ্যা' সেই ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী সীতাকে লাভ করিতে পারিবে না। মায়াসমুদ্রে 'সদ্‌বৃত্তি' বানরগণের সাহায্যে নামের সেতুবন্ধন কর, 'প্রণবধনু' হস্তে রাবণকে আক্রমণ কর...''

শ্রীরামকে সাহিত্যে নিয়ে এসেছিলেন ঠাকুর। কথারামায়ণ, বিজনে বিজয়া, মিলন যজ্ঞ, জগদগুরু রামানন্দ, নাম রসায়ন, শ্রীশ্রী রামনাম মহিমা, মাতাপুত্র ইত্যাদি নানা গ্রন্থে রামকে এত নানারকম দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ আলোচনা করেছেন কিনা সন্দেহ। নাটক, গান কবিতা গীতিকাব্য। অথচ তা অলকানন্দার স্বচ্ছশীতল জলের মতো— নির্ভার নির্ঝর-সরল সহজ। সীতারামকে একালের তুলসীদাস বললে অত্যুক্তি করা হয় না। অহল্যা পাষাণী হোক বা শবরী তাদের আকুল আবেগের ভাষা প্রিয়তম রামের জন্য প্রতীক্ষায় মরম ছুঁয়ে যায়। সীতা ও রামের দাম্পত্যজীবনের প্রতিচ্ছবিতে দাস্য ও মধুর দুই ভাবই ফুটিয়েছেন অনায়াস সাবলীল লেখনীতে।

আজ এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ঠাকুরের স্মৃতিচারণা করা দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়ে। যিনি বলেছিলেন শ্রীরামনামাখিলমন্ত্র- বীজংসঞ্জীবনঞ্চেদ হৃদয়ে প্রবিষ্টম/হলাহলং বা প্রলয়ানলং বা মৃত্যোর্মূর্খং বা বিশতাং কুতো ভীঃ। শ্রীরামনাম অখিল মন্ত্রের বীজ ও জীবনদানকারী, যদি কোনো রূপে কারুর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় তাহলে হলাহল বিষ প্রলয়ের আগুন মৃত্যুর মুখে প্রবেশ করতে ভয় কী? আজ তিনি মিশে গেছেন সপ্তর্ষিমণ্ডলে ধ্রুবতারায়। ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, ত্রিকালদর্শী সবই দেখছেন নিশ্চয়ই। আজ তাঁর ভক্তদের অভীষ্ট পূরণ হয়েছে, আমাদের জীবনকালেই। এ বড়ো কম কথা নয়। তিনি সব রকম রাজনীতির ঊর্ধ্বে ছিলেন। তিনি আজীবন শুধু 'সীতারামদাস', তাই আজকের এই দিন শুধু প্রার্থনা পূরণেরই দিন। তাঁরই লেখা একটি গানের কয়েকটি আখর দিয়ে শেষ করি।

'সুধাপারাবার করিয়া মন্থন, উঠিয়াছে নাম মহারসায়ন, হেলায় শ্রদ্ধায় করিলে সেবন, লভয়ে অনন্দধাম।। গাওরে রসনা গাও উচ্চস্বরে,স্থাবর জঙ্গম নামে যাক ভরে, হউক ধ্বনিত বিশ্ব চরাচরে সুধামাখা রাম নাম।।'' ■

মাটির নীচে হিন্দু স্থাপত্য ওপরে বাবরের জবরদখল

চন্দ্রভানু ঘোষাল

ইতিহাস কখন বাঁক বদলাবে আগে থেকে বলা যায় না। সময় হলে ইতিহাস নিজেই তার আত্মপ্রকাশের রাস্তা খুঁজে নেয়। স্বাধীনতার পর ভারতের প্রকৃত ইতিহাস চেপে রাখার চেষ্টা কম হয়নি। বস্তুত ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ চিরকালের জন্য গুমঘরে পাঠিয়ে দিতেও সক্ষম হয়েছেন বাম ও কংগ্রেস পোষিত ইতিহাসবিদেরা। আশার কথা মোদী সরকারের আমলে ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের পুনরুদ্ধারের কাজ জোরকদমে শুরু হয়েছে। এবং সম্প্রতি সর্বোচ্চ আদালত এই প্রয়াসকে বাড়তি শক্তি জুগিয়েছেন।

অযোধ্যা মামলার রায় দিতে গিয়ে সর্বোচ্চ আদালত আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার উৎখননের রিপোর্টটি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছেন। উল্লেখ্য, ১৯৭৫-৭৬ সালে প্রথমবার, ২০০৩ সালে দ্বিতীয়বার আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া বাবরি মসজিদে খননকার্য চালিয়েছিল। তারই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের পর্যবেক্ষণ : মাটির নীচে যে স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে সেটা হিন্দু রীতির। তাকে কখনই ইসলামিক ধাঁচের স্থাপত্য বলা যায় না। ওখানে রামমন্দির ছিল কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা না গেলেও, ওখানে যে হিন্দুদের কিছু একটা ছিল সেটা স্পষ্ট। অর্থাৎ বাবর খালি জমিতে মসজিদ বানাননি।

বস্তুত, আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া ১৮৬২-৬৩ সাল থেকে রামজন্মভূমি মন্দিরের পাথুরে প্রমাণ খোঁজার প্রয়াস করে আসছে। আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা আলেকজান্ডার কানিংহাম ১৮৬২-তে অযোধ্যায় গিয়েছিলেন বৌদ্ধ যুগের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের কাজে। উল্লেখ্য, এক সময় অযোধ্যা ছিল গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ কেন্দ্র। পর্যটক ফা-হিয়েন অযোধ্যাকে শা-চি নামে বর্ণনা করেছেন। হিউয়েন সাঙের লেখায় অযোধ্যা সাকেত বা সকেত। গৌতম বুদ্ধ এই শহরে জীবনের ছ'টি বছর অতিবাহিত করেছেন। কানিংহাম রামজন্মস্থানে কোনও মন্দির দেখেননি। লিখেছিলেন, সম্ভবত মহাভারতের যুদ্ধের পরই রামজন্মস্থানের মন্দির এবং প্রাসাদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। মহাভারত উদ্ধৃত করে কানিংহাম লিখে গেছেন, ইক্ষ্বাকু বংশের শেষ সম্রাট বৃহদ্বল (রামের বত্রিশতম উত্তরপুরুষ) কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। যুদ্ধে তিনি নিহত হন। কানিংহামের মতে তারপরই অযোধ্যার মন্দির ধ্বংস হয়ে যায়। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে রাজা বিক্রমাদিত্য এখানে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ যখন অযোধ্যায় গিয়েছিলেন তখন সেই মন্দিরের কোনও চিহ্ন ছিল না। সপ্তম শতকে অযোধ্যা পুরোপুরি বৌদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়েছিল।

১৮৮৯-৯১ সালে আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার একটি দল অ্যালয়িস অ্যানটন ফুহ্রারের নেতৃত্বে অযোধ্যার প্রাচীনত্ব নিয়ে একটি সমীক্ষা করেছিল। কিন্তু তারা অযোধ্যায় কোনও উল্লেখযোগ্য প্রাচীন মূর্তি, স্থাপত্য বা স্তম্ভ দেখতে পাননি। কিন্তু শহরের নানা জায়গায় বাড়ি বা প্রাসাদ নির্মাণে ব্যবহৃত ইট কাঠ পাথর চুনসুরকির মশলা ইত্যাদি যা এক কথায় রাবিশ নামে পরিচিত তার স্তূপ দেখেছিলেন। এইসব মালমশলা ফৈজাবাদের মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় বাড়ি তৈরির কাজে ব্যবহার করা হতো। স্তূপগুলির মধ্যে প্রাচীনতম তিনটির নাম মণিপর্বত, কুবের পর্বত এবং সুগ্রীব পর্বত। কানিংহাম ভেবেছিলেন এইসব স্তূপ বৌদ্ধ গুম্ফার ধ্বংসাবশেষ। কানিংহামের মতো ফুহ্রারও বিশ্বাস করতেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বৃহদ্বলের মৃত্যুর পর অযোধ্যা ধ্বংস হয়ে যায়। পরে তা বিক্রমাদিত্য নির্মাণ করেন। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলে ফুহ্রার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে ইসলামিক আক্রমণের সময় অযোধ্যায় তিনটি মন্দির ছিল। জন্মস্থানম্ (যেখানে রাম

জন্মগ্রহণ করেছিলেন), স্বর্গদ্বারম্ (যেখানে রামকে দাহ করা হয়েছিল) এবং ত্রেতা কে ঠাকুর (যেখানে রাম কোনও এক ব্রতপালন করেছিলেন)। ফুহ্‌রার লিখেছেন, মির খান (মির বাকি?) জন্মস্থানম্ মন্দির ধ্বংস করে ৯৩০ হিজরিতে (১৫২৩ খ্রিস্টাব্দ) বাবরি মসজিদ নির্মাণ করেন। ফুহ্‌রার লিখেছেন বাবরি মসজিদ নির্মাণে জন্মস্থানম্ মন্দিরের বহু স্তম্ভ ব্যবহার করা হয়েছিল। যার মধ্যে তিনটি ছিল কালো পাথরের, স্থানীয়রা একে বলত কসৌটি। অওরঙ্গজেব স্বর্গদ্বারম্ এবং ত্রেতা-কে-ঠাকুর মন্দির ধ্বংস করে ওখানে মসজিদ নির্মাণ করেন। পরে তাও ধ্বংস হয়ে যায়। মসজিদের ধ্বংসাবশেষ থেকে ১২৪১ সম্বতে (১১৮৫ খ্রিস্টাব্দ) কনৌজরাজ জয়চন্দ্রের খোদাই করা একটি শিলালেখ পাওয়া গেছে যা থেকে জানা যায় ত্রেতা-কে-ঠাকুর মন্দিরে বিষ্ণুমূর্তি ছিল। শিলালেখটি ফৈজাবাদ জাদুঘরে সুরক্ষিত রয়েছে।

স্বাধীনতার পর ভারতের রাজনৈতিক চালচিত্র বদলে গেল। ইতিহাস অনুসন্ধানের যে স্বাভাবিক স্পৃহা ব্রিটিশ সরকারের ছিল, সদ্য স্বাধীন ভারতের নতুন সরকার বা কংগ্রেস নেতাদের তা ছিল না। উপরন্তু, ভারতের প্রকৃত ইতিহাস যাতে সদাসর্বদা গোপন থাকে তার জন্য তারা সচেষ্ট থাকতেন। ফলে রাম জন্মভূমির প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান একরকম ধামা চাপা পড়ে গিয়েছিল বলাই ভালো। শুরু হলো ১৯৭৫-৭৬ সালে। খ্যাতনামা প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক বি.বি.লালের নেতৃত্বে একটি দল রামায়ণে বর্ণিত মোট চোদ্দটি জায়গায় অনুসন্ধান চালাল। কিন্তু এই সমীক্ষক দলের রিপোর্ট প্রকাশ করেনি সরকার। বহু বছর পরে ১৯৯০ সালের অক্টোবরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ অনুপ্রাণিত মন্থন পত্রিকায় বি.বি.লাল দাবি করেন তারা মাটির নীচে কিছু স্তম্ভের শেষাংশ (বেদী বলাই ভালো) পেয়েছেন যা কোনও মন্দিরের অংশবিশেষ হতে পারে।

বি.বি.লালের নেতৃত্বাধীন দলটি পাঁচটি অঞ্চলকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল। অযোধ্যা, ভরদ্বাজ আশ্রম, নন্দীগ্রাম, চিত্রকূট এবং শৃঙ্গভেরপুর হলো সেই পাঁচটি অঞ্চল। প্রত্নতাত্ত্বিক দলটি মাটির নীচে বেশ কয়েকসারি স্তম্ভবেদী আবিষ্কার করেছিল। যা থেকে ওরা সিদ্ধান্ত নেন এক সময় এখানে বাবরি মসজিদের থেকে অনেক বড়ো কোনও স্থাপত্য ছিল। কিন্তু তৎকালীন কংগ্রেস সরকার সমীক্ষক দলের দাখিল করা প্রাথমিক রিপোর্ট হিমঘরে পাঠিয়ে দেয়। সমীক্ষাও বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৮৯ সালে ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা পর্ষদের (আই সি এইচ আর) পত্রিকায় রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। ২০০৮ সালে বি বি লাল তাঁর গ্রন্থ রামা : হিজ হিস্টরিসিটি, মন্দির অ্যান্ড সেতুতে লিখেছিলেন, বাবরি মসজিদের অভ্যন্তরে এবং আশেপাশে বারোটা পাথরের স্তম্ভ পাওয়া গেছে যেখানে নানারকম হিন্দু আধ্যাত্মিক চিহ্ন এবং হিন্দু দেবদেবীদের মূর্তি খোদিত দেখতে পাওয়া যায়। এর থেকে স্পষ্ট, এইসব স্তম্ভ বাবরি মসজিদের অংশ নয়। এগুলো মসজিদ তৈরির আগেই কোনও হিন্দু স্থাপত্যের অংশ ছিল।

১৯৯২ সালে রামকোট পাহাড়ের কাছে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালায় আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া। নেতৃত্বে ছিলেন ড. ওয়াই ডি শর্মা এবং ড. কে এম শ্রীবাস্তব। ওরা মাটির নীচে বহু হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে একটি বেশ বড়োসড়ো বিষ্ণুমূর্তি পেয়েছিলেন। ওদের মতে এই মূর্তি বড়ো কোনও মন্দিরে (ত্রেতা-কে-ঠাকুর মন্দির?) ছিল। অধ্যাপক এস. পি. গুপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক দলটির আবিষ্কৃত মূর্তি পরীক্ষা করে বলেছিলেন, মূর্তি-সহ যেসব জিনিস পাওয়া গেছে সেগুলি দশম এবং দ্বাদশ শতাব্দীর। সেই সময় প্রতিহার এবং গাহড়োওয়াল রাজবংশের শাসন ছিল।

এরপর ২০০৩ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনৌ বেঞ্চের নির্দেশে আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার উদ্যোগে আর একবার খননকার্য চালানো হয়। এতে অংশগ্রহণকারী ১৩১ জন শ্রমিকের মধ্যে ৫২ জন ছিলেন মুসলমান। ২০০৩ সালের ১১ জুন সমীক্ষার অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করা হয়। অন্তিম রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ওই বছরের আগস্ট মাসে। রিপোর্টে বলা হয়েছে : বাবরি মসজিদের নীচে পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ অভিমুখী ইটের পাঁচিল পাওয়া গেছে। এছাড়া পাওয়া গেছে চিত্রায়িত রঙিন মেঝে, অনেকগুলো স্তম্ভবেদী এবং একটি ১.৬৪ মিটার দৈর্ঘ্যের কালো পাথরের অলংকৃত স্তম্ভ। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার, পাওয়া গেছে একটি সিঁড়ির ধ্বংসাবশেষ যার দুদিকে কালো বেসাল্ট পাথরে নির্মিত দুটি স্তম্ভ। স্তম্ভের গায়ে প্রস্ফুটিত পদ্মে পায়ের ওপর পা রেখে বসে থাকা কারোর আবক্ষমূর্তি। যার দুদিকে পেখম মেলে নৃত্যরত দুটি ময়ূর।

উৎক্ষননের ফলে প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সমীক্ষকেরা ঐক্যমত্যে পৌঁছেছিলেন যে কোনও এক সময় বাবরি মসজিদের নীচে এক সুবিশাল স্থাপত্যের অস্তিত্ব ছিল। এবং এই স্থাপত্য ছিল হিন্দুরীতির। কারণ প্রাচীনকালে নির্মাণরীতি ছিল উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম অভিমুখী। অনেক পাথরের প্লেট পাওয়া গেছে যা পদ্ম কৌস্তভ মণি ইত্যাদি হিন্দু চিহ্ন দ্বারা অলংকৃত। এই ধরনের প্লেট প্রাচীরের গায়ে লাগানো হতো। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে প্লেটগুলি অন্তত ১৫০০ বছরের পুরনো। আবার কিছু প্লেট পাওয়া গেছে যার বয়েস ২৫০০ বছরের কম হবে না।

সম দূরত্বে নির্মিত ৩০টি স্তম্ভবেদী পাওয়া গেছে। সমান্তরাল দুই সারিতে সাজানো বেদীগুলি উত্তর থেকে দক্ষিণ অভিমুখে নির্মিত। পাওয়া গেছে একটি অষ্টকৌণিক যজ্ঞকুণ্ড। ২০০০ বছর ধরে ভারতে গৃহনির্মাণে সুরকি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রাম জন্মভূমির মন্দির নির্মাণে সুরকির বহুল ব্যবহার হয়েছিল। মন্দির নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছিল একদিক বাঁকানো— এমনকী বৃত্তকার গড়নের ইট। গৃহনির্মাণে এই রীতি প্রাচীন ভারতবর্ষে অনুসরণ করা হতো। ইসলামিক শাসন প্রবর্তিত হবার পর এর চল ছিল না। আধুনিক ভারতেও গোলাকার ইট ব্যবহার করা হয় না। গুপ্তযুগ এবং কুষাণ যুগের ইট পাওয়া গেছে। গাহড়োয়াল যুগে তৈরি পাঁচিলও পেয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা। তবে এই অঞ্চলে সাধারণ মানুষের বসবাসের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। প্রত্নতাত্ত্বিকদের অভিমত, স্থানটি ছিল অত্যন্ত পবিত্র। এখানে এমন কারোর মূর্তি ছিল যার পুজো হতো সাড়ম্বরে। দেশের নানা প্রান্ত থেকে পুণ্যকামীরা তাঁর কাছে আসতেন। অযোধ্যায় এখনও তীর্থযাত্রীরা সমবেত হন। সরযূ নদীতে স্নান করে শ্রীরামের পুজো করেন।

২০০০ বছর আগেও ছবিটা সম্ভবত এখনকার মতোই ছিল। অন্তত ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ বিচার করলে তাই মনে হয়। ■

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ভারতীয় সভ্যতার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করার পথ চলা শুরু

সোমনাথ গোস্বামী

ভারতের সব থেকে চর্চিত মামলার অবশেষে যবনিকাপাত হলো। কিন্তু আইন বিষয়টাই এমন জটিল যে, যে কোনো বক্তব্যের পরস্পর বিরোধী তত্ত্ব উদ্ভাবন করা যায়। অযোধ্যা রায়ের দুটি বক্তব্যকে ঘিরে এক শ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী একে হিন্দু আধিপত্যবাদের বিচার বিভাগীয় স্বীকৃতি বলে প্রচার করতে শুরু করেছেন। এক হলো ১৯৯২ সালে তৎকালীন মুসলমান পক্ষের দাবি অনুযায়ী বাবরি ধাঁচার উপরে আক্রমণের নিন্দা এবং দ্বিতীয়টি হলো অযোধ্যা ভূখণ্ডের মধ্যেই কোনও এক স্থানে ৫ একর জমিতে মসজিদ নির্মাণ করার আদেশ দেওয়া। রায় ঘোষণার পর পরই বিভিন্ন প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রে একাধিক লেখা প্রকাশিত হয় যেখানে এই রায়কে হিংসার দ্বারা জোর করে আস্থার প্রতিষ্ঠা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু ঘটনা হলো ঠিক উল্টো, অযোধ্যা মামলা আসলে একটি শাশ্বত সত্যকে ভোটব্যাঙ্ক নির্ভর রাজনীতি রূপ পাথরের নীচে চাপা দিয়ে রেখে হিন্দুদের কয়েক প্রজন্মকে তাদের আরাধ্য দেবতাকে তাঁর জন্মভূমি ও পুণ্যভূমিতে গিয়ে দর্শন ও পুজো করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখার চেষ্টা। কীভাবে?

১. বাবরি ধাঁচা যা নাকি প্রথম মুঘল শাসক বাবর ১৫২৮ সালে তার সেনাপতি মির বাকিকে দিয়ে নির্মাণ করিয়েছিলেন তাঁর কোনো প্রামাণ্য দলিল নেই। বাবরের আত্মজীবনী বাবরনামাতে বাবরি মসজিদের কোনো উল্লেখ নেই, ১৫৭৪ সালে রচিত তুলসীদাসের রামচরিতমানসে অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের জন্মোৎসব পালনের সুদীর্ঘ বর্ণনা থাকলেও সেখানে কোনও মসজিদের উপস্থিতির কথা বলা হয়নি। ১৫৯৮ সালে আবুল ফজল যখন আইন-ই-আকবরি-র তৃতীয় খণ্ডের সংকলন সম্পূর্ণ করেছেন সেখানেও অযোধ্যায় মহা ধুমধামের সঙ্গে রাম জন্মোৎসব পালনের উল্লেখ থাকলেও কোনও মসজিদের উল্লেখ নেই। ১৬১১ সালে ইংরেজ পরিব্রাজক উইলিয়াম ফিংচ অযোধ্যা ভ্রমণ করেছিলেন, তিনি অযোধ্যায় বহু তীর্থযাত্রী এবং পাণ্ডাদের উপস্থিতিও লিপিবদ্ধ করেছিলেন কিন্তু কোনও মসজিদের কথা উল্লেখ করেননি।

২. পৌরাণিক যুগ থেকেই অযোধ্যা হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত পুণ্যস্থান। গরুড় পুরাণে অযোধ্যাকে সপ্তপুরীর অন্যতম হিসেবে বর্ণিত করা হয়েছে, যেখানে ভ্রমণ করলে মোক্ষ লাভ করা যায়। প্রাচীন ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম কোশল মহাজনপদের রাজধানী ছিল অযোধ্যা। তখন এর নাম ছিল সাকেত নগর, একাধিক বৌদ্ধ, জৈন, গ্রিক এবং চীনা গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। গুপ্তযুগে অযোধ্যা তাঁর কৌলিন্যের শিখরে পৌঁছায়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতী গুপ্ত রামভক্ত ছিলেন এবং তাঁর পুত্র প্রভারসেনা সেতুবন্ধ নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যেখানে শ্রীরামকে ভগবান বিষ্ণুর অবতার হিসেবে বর্ণনা করা হয়। এছাড়াও তিনি নাগপুরের কাছে রামটেক নামক স্থানে একটি রামমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। গুপ্তযুগের মহান কবি কালিদাস রচিত রঘুবংশ নামক মহাকাব্যের রঘু হলেন শ্রীরামচন্দ্রের প্রপিতামহ। শুধু হিন্দুদের কাছেই নয়, গৌতম বুদ্ধ এবং মহাবীর জৈন তাঁদের জীবনের অনেকটা সময় এই অযোধ্যায় কাটিয়েছেন। পাঁচ জন জৈন তীর্থঙ্কর যথাক্রমে ঋষভনাথ, আজিতনাথ, অভিনন্দননাথ, সুমতিনাথ এবং অনন্তনাথ এই পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছেন। গুপ্ত যুগের পর গাড়োওয়াল যুগে অর্থাৎ একাদশ শতাব্দীতে অযোধ্যা ও সন্নিহিত অঞ্চলে কয়েকশো মন্দির স্থাপিত হয় যার বেশিরভাগই আওরঙ্গজেবের শাসনকালে ধ্বংস করা হয় যার বর্ণনা স্বয়ং আওরঙ্গজেবের এক পৌত্রী রচিত গ্রন্থ সাহিফা-ই-চাহিল-নাসিহ বাহাদুরশাহী-র ছত্রে ছত্রে আছে।

৩. ১৯৫০ সালে গোপাল সিংহ বিশারদ ফৈজাবাদ দেওয়ানি আদালতে অযোধ্যার বিতর্কিত জমিটির স্বত্ব সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের পক্ষে দাবি করে যে মামলাটি করেছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে ১ এপ্রিল, ১৯৫০ সালে কোর্ট শিবশঙ্কর লাল নামক ব্যক্তিকে কমিশনার নিযুক্ত করে বিতর্কিত স্থানটির সরেজমিনে খতিয়ে দেখে তার রিপোর্ট দিতে বলে। ২৫ জুন কমিশনার তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন। সেখানে তিনি মসজিদ বলে দাবি করা অংশটির চারপাশে ১২টি স্তম্ভ দেখতে পান যার কোনোটিতে তাণ্ডবনৃত্যরত ভগবান শিব, কোনোটিতে হনুমানজী, কোনোটিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবয়ব দেখতে পান। ১৭৬৬ সালে জোসেফ টিফিন্থাটার এই স্তম্ভগুলির কথাই বলেছিলেন, ১৯৫০ সালে জোসেফ বর্ণিত ১৪টি স্তম্ভের মধ্যে ২টি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

৪. অযোধ্যা মামলা চলাকালীন যতগুলি প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য হয়েছে তার মধ্যে এলাহাবাদ হাইকোর্টের নির্দেশে ২০০৩ সালে যে খননটি হয়েছিল তার রিপোর্টটিকে কালানুক্রমিক ভাবে সাজালে দেখা যাবে তাতে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সুলতানি শাসনকাল পর্যন্ত কোনও ইসলামিক স্থাপত্য নেই। বরং বিভিন্ন সময়ে ক্ষুদ্র থেকে বৃহদাকার হিন্দু স্থাপত্য পাওয়া গেছে। সুতরাং সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ১৪২ ধারা প্রয়োগ করে যে ৫ একর জমি মসজিদ নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করার নির্দেশ দিয়েছে তা এদেশের ধর্মনিরপেক্ষতার কাঠামোটিকে সুদৃঢ় করার জন্য। তাকে ধর্মীয় নিপীড়নের ক্ষতিপূরণের বৈধতা হিসেবে দেখা ঠিক নয়। ■

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ভারতবর্ষের আদি ও আদর্শ রাষ্ট্রপুরুষ শ্রীরামচন্দ্র

বিজয় আঢ্য

অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দির নির্মাণ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় আজ সবার জানা। যেখানে 'রামলালা বিরাজমান' সেখানে রামমন্দির নির্মাণে রায় দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট আরও একবার প্রমাণ করল—সনাতন ঐতিহ্যই ভারতের আসল ধর্মাচরণ বা জীবনধারা (way of life)। উল্লেখ্য, ২০১০-এর ৩০ সেপ্টেম্বর এলাহবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চ রামজন্মভূমির প্রতি ভারতীয় জনমানসের সনাতন আস্থার প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ সর্বসম্মতভাবে দুটি বিষয়ের উপর সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এক, ধর্মবিশ্বাস ও দুই, ইতিহাস তথা আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (এ. এস. আই)-র রিপোর্ট। কোর্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে ১৮৫৭ সালের আগে থেকেই হিন্দুরা নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী ওই জমিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে উপাসনা করতেন। তাঁদের বিশ্বাস ওই জমিতেই রাম জন্মেছেন। তাই ওই জমির উপর হিন্দুদের সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে বলে মনে করে কোর্ট। এই রায় প্রকাশের কয়েক মাস আগে এক নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ বাঙ্গলার সমাজজীবনে শ্রীরামের এত গুরুত্ব আছে বলে মনে করেন না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি পছন্দ করেন না। এই প্রসঙ্গে জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা'-র রামায়ণ পড়ার স্মৃতিচারণার কথা মনে পড়ছে—''ব্রজেশ্বরের কাছে সন্ধ্যেবেলায় দিনে দিনে শুনেছি কৃত্তিবাসের সাত কাণ্ড রামায়ণটা। সেই পড়ার মাঝে মাঝে এসে পড়ত কিশোর চাটুয্যে। সমস্ত রামায়ণের পাঁচালি ছিল সুরসমেত তার মুখস্থ। সে হঠাৎ আসন দখল করে কৃত্তিবাসকে ছাপিয়ে দিয়ে হু হু করে আউড়িয়ে যেত তাঁর পাঁচালির পালা—ওরে লক্ষ্মণ এ কী অলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ।'' হাস্যরসমিশ্রিত স্মৃতিচারণ হলেও বাঙ্গলার জনমানসে শ্রীরামের প্রভাব নিয়ে এরপর বোধ হয় আর কিছু না বলাই ভালো।

ঘটনা হলো, এদেশে যারা নিজেদেরকে 'লেফট-লিবারাল ও

সেকুলার' বলে জাহির করেন তারা এবং অহিন্দু ভারতবাসীদের অধিকাংশ শ্রীরামচন্দ্রকে আদি ও আদর্শ রাষ্ট্রপুরুষ বলে মনে করেন না। রামমন্দির নির্মাণ এই দেশের পরিচিতি (Identity), ঐতিহ্য, স্বাধীনতা ও বিজয় গৌরবের প্রতীক। উপাসনা পদ্ধতি বা রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তনে যে জাতির সংস্কৃতিক বা জাতীয়তার পরিবর্তন হয় না—এই সত্যটি তাঁরা স্বীকার করতে রাজি নন। এই প্রসঙ্গে পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার দুই রাষ্ট্রদূতের মধ্যে এক আলাপচারিতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইন্দোনেশিয়া কী করে মুসলিম দেশ হয়? কেননা ইন্দোনেশিয়ার এয়ারওয়েজের নাম গরুড় এয়ারওয়েজ, টাকায় গণেশের মূর্তি, এখানকার সংসদ ভবনের সামনে মনুর স্ট্যাচু যার নীচে লেখা 'ফার্স্ট ল' গিভার অব দ্য ওয়ার্ল্ড', এমনকী সেদেশে রামায়ণ উৎসব হয়। প্রত্যুত্তরে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত বলেছিলেন, 'সাম সারকামটেন্সেস উই চেঞ্জড আওয়ার রিলিজিয়ন, বাট নট আওয়ার ফোরফাদার্স।' একই উদাহরণ গ্রিকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলেও তারা তাদের পূর্বপুরুষ সক্রেটিস, অ্যারিস্টটল, প্লেটো প্রমুখ মনীষীদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। আমাদের দেশে তা হয়নি। ধর্মান্তরণের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয়তারও পরিবর্তন ঘটে গেছে। তাই শ্রীরাম তাদের কাছে রাষ্ট্রপুরুষ নয়। রামজন্মভূমিতে রামমন্দির নির্মাণের তাই তারা বিরোধী। আজ থেকে একশো বছর আগে দীনেশচন্দ্র সেন 'রামায়ণী কথা' নামে একটি গ্রন্থ লিখেছেন। সেই গ্রন্থের ভূমিকা (৫ পৌষ, ১৩১০) লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।'' আর সেই দুই কাব্যহর্ম্যের অন্যতম রামায়ণের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিটি হলেন শ্রীরামচন্দ্র। তাঁকে কেন্দ্র করেই ঘটনা পরম্পরা আবর্তিত হয়েছে। পুত্র, পতি, ভ্রাতা, বন্ধু, রাজা হিসেবে তাঁর ভূমিকা ও ভাব-ভাবনার কথা ব্যক্ত হয়েছে। এককথায়, ভারতবর্ষ যা চায়, তাঁর মধ্য দিয়েই তা প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের জাতি তথা রাষ্ট্রের আশাআকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-চেতনার প্রতীক হয়ে উঠেছেন। এই সূত্রেই তিনি রাষ্ট্রপুরুষ।

স্মরণ রাখতে হবে, মহর্ষি বাল্মীকির কাছে শ্রীরামচন্দ্র মানুষ, দেবতা নন। মহর্ষি একজন সর্বগুণান্বিত মানুষের সন্ধান করছিলেন এবং দেবর্ষি নারদকে সেই মানুষের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উত্তরে নারদ বলেছিলেন একসঙ্গে এত গুণের সমাবেশ ঘটেছে এমন কাউকে তো মনে পড়ছে না। তবে যে নরশ্রেষ্ঠের মধ্যে সদ্‌গুণের সমাবেশ ঘটেছে, তিনি অযোধ্যার রঘুপতি রাম।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় বিষয়টি অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—

কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম.......
নারদ কহিলা ধীরে 'অযোধ্যার রঘুপতি রাম।' (রবীন্দ্র রচনাবলী ৩য় খণ্ড কবিতা)

ব্যাধের বাণে নিহত ক্রৌঞ্চকে ঘিরে ক্রৌঞ্চীর কাতর বিলাপ দেখে বাল্মীকির হৃদয়ে যে শোকের উদ্রেক ও নিজের অজান্তেই তাঁর মুখ থেকে শ্লোকাকারে প্রকাশ, তা থেকেই যেন বাল্মীকি রামায়ণের সূত্রপাত। নিষাদের (ব্যাধের) ক্রৌঞ্চবধ যেন রামের জীবনে বারবার ছায়া ফেলেছে। অভিষেকের চরম আনন্দ মুহূর্তে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো বনবাস যাত্রার নির্দেশ, বনবাস শেষে অযোধ্যায় ফেরার প্রস্তুতিপর্বে সীতাহরণ এবং রাজ্যজয়ে সুখের মুখ একটু যখন দেখছেন, তখন লোকনিন্দার ভয়ে গর্ভবতী সীতাকে বনবাসে প্রেরণ। এই দীর্ঘ জীবনবৃত্তে এত বিপরীত পরিস্থিতিতেও তিনি কখনও মর্যাদার রেখা অতিক্রম করেননি।

ভারতবর্ষের মানুষের কাছে তাই শ্রীরাম 'মর্যাদাপুরুষোত্তম'।

মানুষের মধ্যে উত্তম অর্থাৎ মানব জীবনের মহান আদর্শ। তাঁর জীবনের অনেক বেদনাদায়ক ও জটিল পরিস্থিতির মধ্যেও মর্যাদার লক্ষ্মণরেখা কোনওদিন অতিক্রম করেননি। যার যা মর্যাদা প্রাপ্য তাঁকে তা দান করেছেন। আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ স্বামী, আদর্শ প্রজানুরঞ্জক রাজা, এমনকী শত্রু হিসেবেও নিজের আচরণ সম্বন্ধে সাবধান থাকতেন, যথাযথ মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করতেন।

মন্ত্রবিদ অস্ত্রবিদ ঋষি বিশ্বামিত্র যজ্ঞস্থল রক্ষার জন্য রাজা দশরথের কাছ থেকে রাম ও লক্ষ্মণকে চেয়ে নিয়ে গেছিলেন। বিশ্বামিত্র রামকে দীক্ষা দিয়ে 'বলা ও অতিবলা' নামে দুটি মন্ত্র দান করলেন। তখন রাম আর রাজপুত্র নন, একান্ত অনুগত শিষ্য। বিশ্বামিত্রের আদেশ মান্য করে স্ত্রীজাতি অবধ্য হলেও বধ করলেন অত্যাচারিণী তাড়কা রাক্ষসীকে। পরে মারীচ, সুবাহু ও অন্যান্য রাক্ষস যজ্ঞস্থল অপবিত্র করতে এলে রামের শরাঘাতে নিহত হলো। বিশ্বামিত্র রামকে আশীর্বাদ করে বললেন, তুমি গুরুবাক্য রক্ষা করেছ, এই সিদ্ধাশ্রমের নাম সার্থক হলো। নিজের জীবনকে বিপন্ন করেও শ্রীরাম কর্তব্যপরায়ণ এবং গুরুদেবের প্রতি মর্যাদা রক্ষাকারী। বন্ধুদের প্রতিও শ্রীরাম তাঁর জীবনে অপূর্ব মর্যাদা স্থাপন করেছেন। বশিষ্ঠপুত্র সুযজ্ঞ, নিষাদরাজ গুহক, জনজাতি বানররাজ সুগ্রীব—সকলের সঙ্গে রামচন্দ্র বন্ধুত্বের মর্যাদা দেখিয়েছেন।

মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে সীতার অবস্থানকালে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। শাস্ত্রবিধি অনুসারে গৃহস্থ যজমান সস্ত্রীক যজ্ঞে ব্রতী হবেন। কিন্তু রাম আবার বিবাহ না করে সীতার স্বর্ণময়ী মূর্তি পাশে বসিয়ে যজ্ঞে ব্রতী হয়েছিলেন। স্ত্রীর প্রতি মর্যাদা স্থাপনের এমন দৃষ্টান্ত বিরল। আজীবন সীতার প্রতি রামের প্রেম ও মর্যাদাবোধ ছিল অটুট। সমাজে স্ত্রীর প্রতি মর্যাদা স্থাপনের জন্য বরণ করেছিলেন একপত্নীব্রত। রামচন্দ্রের স্মরণে ছিল যে তাঁর পিতা দশরথ বৃদ্ধ বয়সে কৈকেয়ীর পাণিগ্রহণ করে যে সমস্যার বীজ বপন করেছিলেন, সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি তিনি করবেন না। কেননা, তাঁর কাছে নিজের সুখ, পরিবার প্রীতির চেয়ে অনেক বড়ো ছিল আদর্শ রাজ্যশাসন। তার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল সত্যের ভিত্তিতে। শ্রীরামচন্দ্রের সেই সত্যনিষ্ঠার মর্যাদা আজও আমাদের মধ্য দিয়ে চলেছে। ভারতবর্ষের প্রতীক অশোক স্তম্ভের নীচে 'সত্যমেব জয়তে' তার প্রমাণ।

শিষ্য হিসেবে যেমন, পুত্র হিসেবেও তাঁর আচরণ লক্ষ্য করার মতো। রামের রাজ্যাভিষেকের সকল আয়োজন যখন সম্পূর্ণ, তখনই কৈকেয়ীর কাছে চৌদ্দ বছর বনবাসে যাওয়ার রাজাজ্ঞা শুনলেন। এই নিষ্ঠুর আদেশ শুনেও রামের শোক বা বেদনা হলো না—'ইতীব তস্যাঃ পুরুষং বদন্ত্যাং ন চৈব রামং প্রবিবেশ শোকম্।' (বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যা)। মুহূর্তকাল নিশ্চল থেকে অবিকৃতচিত্তে বললেন—

—তাইই হোক, জটাচীর ধারণ করে রাজাজ্ঞা পালনের জন্য বনবাসী হবো '—এবমস্তু গমিষ্যামিবনং'।

পুত্র হিসেবে রাম পিতার প্রতিজ্ঞা পালনের ভার নিয়েছেন। বলেছেন—''অতীয়াৎ সাগরো বেলাং ন প্রতিজ্ঞামহং পিতুঃ।'' —(আযোধ্যাকাণ্ড, ১১২-১৮) সমুদ্র যদি বেলাভূমি অতিক্রমও করে, তবুও পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারব না।

অযোধ্যাকাণ্ডে বনবাস যাত্রার সময় সবাই যখন অধৈর্য—শোকাকুল, ক্রোধোন্মত্ত, তখন রামচন্দ্র অপূর্বরূপে সংযমী, ত্যাগপরায়ণ। তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা অপরকে ত্যাগ স্বীকারে প্রণোদিত করেছে।

শ্রীরাম ছিলেন প্রজাবৎসল। বনবাসে যাওয়ার আগে তাঁর নিজস্ব যা কিছু ধনসম্পত্তি ছিল সেগুলি লক্ষ্মণের মাধ্যমে বিবিধজনকে দান করেছেন। বনবাস যাত্রাকালে অযোধ্যার সীমা পর্যন্ত আবালবৃদ্ধ প্রজারা রামের পশ্চাতে চলেছিল— 'রামমেবাভিদুদ্রাব ঘর্মার্তঃ সলিলং যথা।' (বা. রা)

শ্রীলঙ্কা বিজয়ের পর অপহৃতা সীতাকে উদ্ধার করে বনবাস শেষে শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরলেন এবং রাজ্য লাভ করে পরম আনন্দে প্রজাপালন করতে লাগলেন। রামের রাজত্বকালে প্রজাদের মধ্যে শুধু রাম, শুধুমাত্র রামের কথাই কীর্তিত হতো—'রামো রামো রাম ইতি প্রজানামভবন্ কথাঃ (যুদ্ধকাণ্ড ১২৮)

রামরাজ্যে গণতন্ত্র— একজন মানুষ, একটি ভোট— এরকম অধিকার ছিল কিনা সেটা বড়ো কথা নয়, মানুষ সুখে ছিল কিনা সেটাই বড়ো কথা। রাজা মনে করতেন প্রজারা অসুখী হলে সেই অপরাধের দায় রাজার উপরে এসে পড়ে। আমরা যাকে এখন সুস্থ জীবন বলি, তাঁর যুগের মানদণ্ডে রামরাজ্যে তা ছিল। রামরাজ্য রাষ্ট্র ব্যবস্থার আদর্শ একথা গান্ধীজী বারবার বলেছেন। যে রাজার রাজত্বে এই আদর্শ স্থাপিত হয়, তিনিই তো প্রকৃত রাষ্ট্রপুরুষ। সেই দিক থেকে রামচন্দ্র প্রতিযুগেই শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রপুরুষের আদর্শ।

শ্রীরামচন্দ্র প্রতাপশালী রাজা ছিলেন, কিন্তু কখনও পররাজ্য দখলের ইচ্ছা তাঁর ছিল না। শ্রীলঙ্কা জয় করার পর তিনি লঙ্কার সিংহাসনে বিভীষণকে বসিয়েছেন। তিনি নিজের মাতৃভূমি ভারতবর্ষকেই জননী ও স্বর্গাদপি গরীয়সী বলে মনে করতেন। তথাগত বুদ্ধ তাঁর মুক্তির জন্য স্ত্রীকে ত্যাগ করেছিলেন। আর শ্রীরাম প্রজাদের কল্যাণের জন্য স্ত্রীকে ত্যাগ করেছিলেন। রাক্ষস, বানর, চণ্ডাল, শবর প্রভৃতি রাজ্য নিজের শাসনাধীনে না এনে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ করেছিলেন। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এক অনন্য নজির গড়ে তোলেন।

যারা শ্রীরামকে যিশু বা বুদ্ধের মতো 'রিয়াল' নন বলে মনে করেন, তাঁদের আর একবার রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ''রামায়ণ সেই নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে। রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজগুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।'' তাই শ্রীরাম ভারতীয় রাষ্ট্রজীবনের আদি ও আদর্শ রাষ্ট্রপুরুষ। শ্রীরামচন্দ্রের জীবনাদর্শ সকল ভারতীয়রই অনুকরণযোগ্য। সুপ্রিম কোর্ট এই ভাবাদর্শকেই স্বীকৃতি জানিয়েছে। ■

রাম জন্মভূমি মামলার রায় এবং কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির মত

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

ভারতের শীর্ষ আদালত ঐকমত্যের ভিত্তিতে দীর্ঘতম মামলার রায় দিয়েছেন। চারটে মামলা ছিল— একটা পূজারি গোপাল সিংহ বিশারদ, দ্বিতীয় নির্মোহী আখরা, তৃতীয় ইউপি সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ড আর চতুর্থ দেবতা 'রামলালা বিরাজমান'। এলাহাবাদ হাইকোর্ট মূল অংশে হিন্দুদের পুজোর অধিকার দিয়েছিলেন। তাঁরা বিতর্কিত এলাকাকে তিন ভাগে ভাগ করে হিন্দু, নির্মোহী আখড়া ও মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশ করে দিয়েছিলেন। সুপ্রিমকোর্টে চ্যালেঞ্জ হয়। পর্বতপ্রমাণ সাক্ষ্য ছিল। সুপ্রিম কোর্ট সব সাক্ষ্যপ্রমাণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন। ১৯৭০ সালে ফৈজাবাদের কমিশনার ও সেটলমেন্ট আধিকারিক পি কার্নেগী লিখেছেন, "মহম্মদিদের কাছে মক্কা যা, হিন্দুদের কাছে অযোধ্যাও তাই।" আদালত লক্ষ্য করেছেন যে মসজিদ তৈরির পর ৩২৫ বছর সময়কালে ব্রিটিশরা গ্রিলের প্রাচীর না তোলা পর্যন্ত মুসলমানদের সেখানে কোনো অধিকার ছিল এর প্রমাণ তারা দিতে পারেননি। তিনটে গম্বুজাকৃতি কাঠামোর বাইরে হিন্দু ধর্মীয় প্রতীক বরাহ, জয়-বিজয় ও গরুড়ের প্রতীক ছিল, মুসলমান সাক্ষীরা তা স্বীকার করেছেন। তাতে আস্থা ও বিশ্বাসের কথা শুধু বোঝায় না, সেখানে সত্যি সত্যিই পূজার্চনা হতো।

> রামমন্দির- কাম-বাবরি ধাঁচা যদি ভাঙা না হতো তবে কি মাটির তলায় কী আছে তা দেখা সম্ভব হতো? আর সর্বোচ্চ আদালতের পক্ষে এত জোর দিয়ে কি বলা সম্ভব হতো যে ওর নীচে কোনো ইসলামিক স্থাপত্য ছিল না? অর্থাৎ অযোধ্যার তথাকথিত বাবরি ধাঁচা ভাঙা প্রয়োজনীয় ছিল আর সেই কারণে তা অবৈধ নয়।

আদালত তাঁর রায়ে বলেছেন এটা শুধু একটা কাঠামো ধ্বংসের ব্যাপার নয়, কোটি কোটি হিন্দুর বিশ্বাস ও আস্থার ব্যাপার। রায়ে রামলালার অনুকূলে সম্পূর্ণ অধিকার দিয়েছেন আর মুসলমানদের জন্য কোনো উপযুক্ত স্থানে ৫ একর জমি মসজিদ নির্মাণের জন্য আদেশ দিয়েছেন। মন্দির নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ট্রাস্ট গঠন করে তিন মাসের মধ্যে পরিকল্পনার রূপরেখা স্থির করতে বলেছেন। সর্বোচ্চ আদালত এলাহাবাবাদ হাই কোর্টের রায় খারিজ করেন ও নির্মোহী আখড়ার মামলা বাতিল হয়।

তাঁরা এই কটি সাক্ষ্যপ্রমাণকে মোটের উপর জোর দিয়েছিলেন : ধর্মীয় শাস্ত্র, ভ্রমণকাহিনি, গেজেটিয়ার, স্তম্ভের উপর খোদিত শিলালিপি, প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের বিবরণ, মসজিদ ভাঙার আগের ফোটোগ্রাফ ও বিতর্কিত স্থানে প্রাপ্ত কলাকৃতি। তাঁরা

বলেছেন খননের ফলে স্পষ্ট প্রমাণ মিলেছে যে সেখানে যে কাঠামো ছিল তা ইসলামিক ধাঁচের নয়, হিন্দু ধাঁচের। তবে তা রামের মন্দির ছিল কিনা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না।

শীর্ষ আদালত গত ৯ নভেম্বর শতাব্দী-প্রাচীন অযোধ্যায় রামজন্মভূমি বাবরি মসজিদ বিতর্কিত মামলার একটা সন্তোষজনক ইতি টেনেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কিছু বিশিষ্টজন বলে পরিচিত ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করেছেন। অযোধ্যা রায় দানের পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এ কে গাঙ্গুলি শীর্ষ আদালতের রায়ে তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁর আপত্তি জমিটিকে রামমন্দির নির্মাণের জন্য রায় দেওয়ায়। তিনি বলেছেন সংখ্যালঘুদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে।

শীর্ষ আদালত বিবাদ-কন্টকিত অযোধ্যা মামলার চূড়ান্ত শুনানির এক মাসের কম সময়ে তাঁদের চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করেছেন। শ্রী গাঙ্গুলি বলেছেন, ‘‘আমি হতবুদ্ধি ও অপ্রসন্ন। সংবিধান সকলকে অধিকার দিয়েছেন এবং ন্যায়বিচার প্রত্যেককে দিতে হবে, কিন্তু এই মামলায় সংখ্যালঘুদের প্রতি ন্যায়বিচার করা হয়নি।’’ যে রায় দেওয়া হয়েছে তাতে প্রশ্ন তুলে শ্রী গাঙ্গুলি জিজ্ঞাসা করেছেন, ‘‘এটা অস্বীকার করা যায় না যে গুন্ডামি করে মসজিদ ভাঙা হয়েছিল। এমনকী শীর্ষ আদালত তাঁদের চূড়ান্ত রায়ে বলেছেন যে আইনের শাসনের ভয়ংকর রকমের লঙ্ঘন ও ভাঙচুর করা হয়েছে। ‘‘আদালত দেখেছেন বর্বরতার (ভ্যান্ডালিজম) দ্বারা মসজিদ ভাঙা হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে এটা বিচার্য কোন পক্ষের প্রতি অবিচার করা হয়েছে, সংখ্যালঘুদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে।’’ কিন্তু তাঁর এই অভিমতের কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেননি।

প্রদত্ত রায়ের প্রতি তিনি প্রশ্ন তুলে বলেছেন, ‘‘আদালত দেখেছেন যে কোনো মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরি হয়নি। মসজিদের নীচে কোনো মন্দিরের অস্তিত্বের প্রমাণ মেলেনি এবং সংবিধানের বিধি অনুসারে মসজিদ ভাঙা সেই বিধির চূড়ান্ত লঙ্ঘন। এখন তাঁরা কিসের ভিত্তিতে বলেছেন যে এটা সব হিন্দুদের বিশ্বাস জমির মালিক রামলালা?’’ এখানে বলতেই হয় যে হয় শ্রী গাঙ্গুলি পুরাতাত্ত্বিক রিপোর্ট দেখেননি অথবা সজ্ঞানে অসত্য বলছেন। পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের খননকার্যের বিস্তারিত বিবরণ দেখার সুযোগ বর্তমান লেখকের হয়েছে। তাতে যা দেখা যাচ্ছে সেখানে একটা সম্পূর্ণ কাঠামো ১৫২৫ সালের পূর্ব থেকেই আছে। সেখানকার খিলান, গম্বুজ, মোটিফ, রিলিফ, স্থাপত্য সবই হিন্দু ঐতিহ্যানুযায়ী। সেখানে রাম, শ্যাম বা শিব যারই মন্দির থাক তা হিন্দুদের। এবং দীর্ঘকালীন পুঁথিপত্র, শাস্ত্র, লোকবচন, ভ্রমণ বৃত্তান্ত সব সাক্ষ্য দেয় যে ওই স্থলে রামের আরাধনা হতো।

তিনি এর পরে বলেছেন, ‘‘সংবিধানের ছাত্র হিসাবে আমি বিব্রত। শীর্ষ আদালত সংখ্যালঘু-সহ সব নাগরিকের অধিকার রক্ষার জন্য দায়বদ্ধ। আমার অধিকার কোথায়?’’ তিনি এও বলেছেন, ‘‘আর্কিওলজিক্যাল সাক্ষ্য কি সব? বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কোথায়?’’ এই আর্কিওলজিক্যাল সোসাইটির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা স্বীকৃতি পেয়েছে, অশোকের শিলালিপি, মায়া সভ্যতা, অ্যাজটেক, ইন্‌কা সবই স্বীকৃতি পেয়েছে। কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির কথা তিনি বলেছেন?

১০৪৫ পৃষ্ঠার রায়ে সব তথ্য আছে এখানে আমার তা উল্লেখ করার পরিসর নেই। আসাদুদ্দিন ওয়েইসি বলেছেন সুপ্রিম কোর্ট সর্বোচ্চ, কিন্তু অভ্রান্ত নয়। প্রশ্ন করেছেন, ‘‘বাবরি মসজিদ যদি না ভাঙা হতো তাহলে কী হতো?’’ চমৎকার প্রশ্ন। সত্যিই ওই রামমন্দির- কাম-বাবরি ধাঁচা যদি ভাঙা না হতো তবে কি মাটির তলায় কী আছে তা দেখা সম্ভব হতো? আর সর্বোচ্চ আদালতের পক্ষে এত জোর দিয়ে কি বলা সম্ভব হতো যে ওর নীচে কোনো ইসলামিক স্থাপত্য ছিল না? অর্থাৎ অযোধ্যার তথাকথিত বাবরি ধাঁচা ভাঙা প্রয়োজনীয় ছিল আর সেই কারণে তা অবৈধ নয়। ইতিহাসের বাঁকে এমন ঘটনা ঘটে যা পুঁথিগত নীতিকথার ভিত্তিতে অবৈধ। সরকার কখনো মসজিদ ভাঙার অনুমতি দিত না। অথচ মন্দির না ভাঙলে তৎপরবর্তী ভূগর্ভস্থ স্থাপত্য চিরনিদ্রায় বহাল তবিয়েতে থাকত তার অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা ইতিহাসকে চিরসমাধিতে পাঠিয়ে। বাস্তিল দুর্গ ভাঙা কি বিধিসম্মত ছিল? অথচ সারা বিশ্বের তাবৎ উদার মানবতাবাদীরা একে সাধুবাদ জানিয়ে থাকেন। দুক্ষেত্রে দুরকম বিচারধারা হতে পারে না। বৃন্দা কারাত ঠিক এই কাজটাই করেছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন যারা বাবরি মসজিদ (কোর্টের রায়ের পর বাবরি মসজিদ বলা যাবে না) ভেঙেছিল তাদের বিচার কেন হলো না? এর উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন ১৯৯১ সালের আইন মোতাবেক আর কোনো মন্দির মসজিদ ভাঙা যাবে না। এ তো হতে পারে না। হিন্দুর সমষ্টিগত স্মৃতিতে আছে যে মথুরাতে কৃষ্ণের মন্দির ছিল তা মিথ্যা হতে পারে না, এর স্বপক্ষে বহু ভ্রমণ বৃত্তান্ত, পুঁথি, শাস্ত্রের প্রমাণ আছে। এটা কি স্বাভাবিক নয় যে পুরাণ বা মহাভারত যে মথুরাকেই কৃষ্ণের জন্মস্থল বলে চিহ্নিত করেছেন সেখানেই কৃষ্ণের মন্দির থাকবার কথা? কোথায় গেল সেই মন্দির, কে তাকে ধ্বংস করল? যদি ধ্বংস হয় তার ঐতিহাসিক নথি কোথায়?

মক্কায় হজরত মহম্মদ যখন দুর্বল তখন তিনি বলেতেন অন্য ধর্মের মানুষের ওপর জবরদস্তি করা চলবে না। যখন মদিনায় পালিয়ে গিয়ে ক্ষমতা লাভ করলেন (কীভাবে তা আমরা জানি) তখন তিনি ফিরে এসে মক্কা দখল করে প্রথমেই কাবা মন্দিরে ৩৬০টি মূর্তি ভেঙে মসজিদে রূপান্তরিত করেছিলেন। এই আদর্শেই ১৫২৬ সালে পানিপথের যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর ১৫২৮ সালে বাবর নজর দিল ভারতের বড়ো বড়ো মন্দিরে। তাঁর নির্দেশেই সেনাপতি মির বাকি অযোধ্যার রামমন্দির ভেঙে ফেলে। সেকুলারদের মনে করিয়ে দিতে হবে ভারতে মুসলমান দ্বারা হিন্দু নির্যাতনের ৮০০ বছরের ইতিহাস। সেই জন্যই রাজা রামমোহন ব্রিটিশদের এদেশে আসা স্বাগত জানিয়েছেন--- কারণ তা ছিল মন্দের ভালো। ■

বঙ্গপ্রয়াসের শ্যামাপ্রসাদ বঙ্গীয় সম্মান

গত ২ নভেম্বর বঙ্গপ্রয়াস সংগঠনের উদ্যোগে কলকাতার ই জেড সি সি প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় শ্যামাপ্রসাদ বঙ্গীয় সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান। বাংলা সিরিয়াল ও চলচ্চিত্র জগতের শিল্পী, কলাকুশলী, সুরকার ও সংগীতশিল্পীদের সম্মানে ভূষিত করা হয় এই অনুষ্ঠানে। আনন্দঘন পূর্ণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বংলা সিরিয়াল ও চলচ্চিত্র জগতের নবীন-প্রবীণ বহু অভিনেতা-অভিনেত্রী। বঙ্গপ্রয়াস সংগঠনটির লক্ষ্য বাঙ্গলার শিল্প-সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার। পাশাপাশি টালিগঞ্জের চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলাকুশলীদের স্বার্থ রক্ষা করা। এর আগে বঙ্গপ্রয়াসের উদ্যোগে এই বছরই শ্যামাপ্রসাদ শারদ সম্মান প্রদান করা হয়। শ্যামাপ্রসাদ সারদ সম্মান বঙ্গীয় জনজীবনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। শ্যামাপ্রসাদ বঙ্গীয় সম্মান প্রদান বঙ্গপ্রয়াসের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। ই জেড সি সি প্রেক্ষাগৃহের ওই চোখ ধাঁধানো অনুষ্ঠানে জীবনকৃতি সম্মান প্রদান করা হয় অভিনেতা বিশ্বজিৎ চট্টোপধ্যায়, কল্যাণ চট্টেপাধ্যায়, এবং অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়কে। এছাড় বাংলা সিরিয়াল ও সিনেমা জগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, অভিনেত্রী,

পরিচালক, সংগীত পরিচালক, শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী ও কলাকুশলীদের পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার প্রদানে অভিনবত্ব— এবার পুজোয় সেরা ঢাকির দলকে পুরস্কার প্রদান। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন উস্তাদ রসিদ খান, রাঘব চট্টোপাধ্যায়, কার্তিক দাস বাউল ও মিস জোজো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়, রাজ্য সভার সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত, বিজেপি নেতা মুকুল রায়, সাংসদ জগন্নাথ সরকার, রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ প্রমুখ। দর্শকদের অনুরোধে গান গেয়ে আসর মাত করে দেন কৈলাস বিজয়বর্গীয়।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজের আলোচনা সভা

ভারতের গৌরবময় ইতিহাস পুনরুদ্ধারের কাজে যেসব সংস্থা নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে তাদের অন্যতম মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ। সম্প্রতি ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে 'রিভিজিটিং ইন্ডিক থটস্ অ্যান্ড নলেজ সিস্টেম : হিস্টরিক্যাল পার্সপেক্টিভ' শীর্ষক আলোচনা সভা দুদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান সুজিত কুমার ঘোষ ভারতচর্চার ক্ষেত্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও উত্তর-পূর্ব ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলির নিবিড় অনুশীলনের

প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীশ ধনখড় ভারতের ইতিহাসে ড. আম্বেদকর, সরদার বল্লভভাই প্যাটেল, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং বহু প্রজ্ঞাবান মানুষের অবদান যে উপেক্ষিত থেকে গেছে, সেকথা উল্লেখ করে ইনস্টিটিউট যেভাবে সেই বিকৃত ইতিহাস পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে চলেছে তার ভূয়সী প্রসংসা করেন। ইনস্টিটি উটের নবনিযুক্ত পরিচালক ড. স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ ভারতের প্রাচীন জ্ঞানচর্চায় চতুর্বেদ, চতুর্মঠ, চতুর্ধাম ইত্যাদির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। বিভিন্ন গবেষক ভারতের চিরকালীন সমন্বয়বাদী দর্শনের কথা ব্যক্ত করেন। প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যাচর্চায় বহুত্ববাদী চিন্তাভাবনা বিকশিত হয়েছিল তাও উঠে আসে গবেষকদের গবেষণাপত্রে। এমন একটি আলোচনা সভার আয়োজন করার জন্য শ্রোতৃমণ্ডলী ইমস্টিটিউটকে ধন্যবাদ জানান।

বনবাসী কল্যাণ আশ্রম শিবপুর শাখার বনযাত্রা

পূর্বাঞ্চল বনবাসী কল্যাণ আশ্রম শিবপুর শাখার উদ্যোগে গত ১৮ অক্টোবর ৩২ জন সদস্য-সদস্যা কল্যাণ আশ্রমের ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক রাজেন্দ্রভাই মাদলার নেতৃত্বে বনযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। এবারের গন্তব্য ছিল ওড়িশার বালেশ্বর এলাকা। বনযাত্রীরা ৩ দিনে ৬০০ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে কল্যাণ আশ্রমের ৪ টি কেন্দ্র দর্শন করেন। প্রথম দিন বালেশ্বরের বাঙ্গেরি পোশি। সেখানে শ্রদ্ধা জাগরণ কেন্দ্রের বনবাসী ভাই-বোনেরা তাদের সাদর অভ্যর্থনা করেন। এখানে বিশাল হনুমানজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন বনবাসীরা। বিভিন্ন গ্রামে গ্রামবিকাশের প্রকল্প চলছে। এরপর চাকদিতে খেলকুদ কেন্দ্র পরিদর্শন। এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা বনযাত্রীদের

সামনে বিভিন্ন খেলাধুলা ও তিরন্দাজিতে অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন জাতীয় স্তরের পুরস্কার পেয়েছে। পরদিন বনযাত্রীরা ৫১ পীঠের অন্যতম শক্তিপীঠ অম্বিকাদেবীর মন্দির ও দেবকুণ্ড দর্শন করেন। এরপর তাগারিয়া জেলার ঐতিহাসিক গুহা দর্শন। এখানে বাঘা যতীন বিপ্লবীদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিতেন। এরপর খাজুরদিয়া গ্রামে বনবাসী মায়েদের সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দর্শন। কালবাড়িয়াতে কল্যাণ আশ্রমের ছাত্রাবাস দর্শন। ছাত্রাবাসের ২৮ জন ছাত্রের সঙ্গে বনযাত্রীরা ভাব বিনিময় করেন। শেষদিন গোহিরাপালেতে বনবাসীদের নৃত্য-গীতের আসরে বনবাসী নগরবাসী একাত্ম হয়ে যায়।

শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের রাষ্ট্রীয় অধিবেশন

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের ৭ম রাষ্ট্রীয় অধিবেশন গত ৮ থেকে ১০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় গুজরাটের মেহসানাতে। সকাল ৮ টায় সংগঠনের সংগঠনের সভাপতি ঘনশ্যামভাই প্যাটেল সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অধিবেশনের শুভারম্ভ করেন। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ভাই রূপানি ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখ অনিরুদ্ধ দেশপাণ্ডে। সারা দেশ থেকে ৩ হাজার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সংগঠনের তিনটি শাখা—জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘ, বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘ এবং বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘ থেকে ১৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের সভাপতি ও সম্পাদক দেবমাল্য দত্ত ও কৃষ্ণ সরকার, বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের সভাপতি ও সম্পাদক আশিস কুমার মণ্ডল ও গৌরাঙ্গ দাস, বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের সভাপতি ও সম্পাদক অনিমেষ মণ্ডল ও কানুপ্রিয় দাস। অধিবেশনের সমাপন সত্রে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী, কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল, গুজরাটের উপ মুখ্যমন্ত্রী নীতীনভাই প্যাটেল,শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ জগদীশ প্রসাদ সিংহল, সংগঠন সম্পাদক মহেন্দ্র কাপুর প্রমুখ।

গো-গ্রাম কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ বর্গ

অখিল ভারতীয় গোসেবা বিভাগ দ্বারা সারা ভারতে গোরক্ষা, গোভিত্তিক জৈব কৃষি এবং গো আধারিত দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। পশ্চিমবঙ্গের গোসেবা বিভাগও এই কর্মযজ্ঞে শামিল হয়ে গ্রামের কৃষকদের গোপালন, সংরক্ষণ ও সংবর্ধনের জন্য গ্রামের বিভিন্ন ক্লাব ও স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে প্রতি মাসে বিভিন্ন জেলায় প্রশিক্ষণের আয়োজন করে চলেছে। ইতিমধ্যে এরকম ৩২ টি প্রশিক্ষণ বর্গ হয়েছে। তাতে ২৫০ মহিলা সহ ৬৪৮ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এর ফলে গ্রামের পরিবারগুলির গোপালনে আগ্রহ বেড়েছে এবং গোধন বিক্রির প্রবণতা কমেছে। গোবর ও গোমূত্র প্রয়োগে চাষ, ওষুধ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন শুরু হয়েছে।

গুরুনানক জয়ন্তীতে রক্তদান শিবির

গুরুনানক দেবের ৫৫০ তম প্রকাশপর্ব উপলক্ষ্যে গত ১২ নভেম্বর কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ শহরের সারদা শিশুতীর্থে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুব আয়াম বজরংদলের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে শিবিরের সূচনা করেন স্থানীয় একজন ব্যবসায়ী। উপস্থিত ছিলেন বজরংদলের প্রান্ত সংযোজক অমল চক্রবর্তী, প্রান্ত সম্পাদক উদয় শঙ্কর সরকার, প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক অনুপ মণ্ডল। ৬৭ জন রক্ত দান করেন।

চাঁচোলে গুরুনানক জয়ন্তী উদ্‌যাপন

গুরুনানক দেবের ৫৫০ তম প্রকাশপর্ব উপলক্ষ্যে গত ১২ নভেম্বর মালদা জেলার চাঁচোলের শ্যামসুন্দর মন্দিরে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর মালদা জেলা সঙ্ঘচালক দেবব্রত দাস। গুরুনানকদেবের জীবন ও কর্ম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ক্ষেত্রীয় সমরসতা প্রমুখ গৌতম কুমার সরকার। উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের প্রান্ত গ্রাম বিকাশ প্রমুখ গৌতম মণ্ডল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা সভাপতি জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

গ্রাম বাঙ্গলায় গোমাতা পুজো

শৌভিক রাতুল বসু

কোনো কোনো সময় বিধাতাপুরুষ ঐশ্বরিক মুহূর্তে আত্মদর্শনের সুযোগ করে দেন। সে এক ম্যাজিক রিয়ালিজম যেখানে দৃশ্যের জন্ম হয় অলীক প্রেক্ষিতে। অন্ধকারের এক নিজস্ব মায়ামমতা থাকে যা উদ্ভাসিত কিংবা প্রতিবিম্বিত হয় নিজস্ব অভিঘাতে। কলকাতা শহরে অন্ধকার তো অলীক কল্পনা। তবে জ্যোতিবাবুর রাজত্বকাল মনে পড়াতো এই শহরেও অলৌকিক সন্ধ্যে নামে— আটপৌরে প্রলিতারিয়েত, উদোম সন্ধ্যে। পরতে পরত বেয়াড়া অন্ধকারে ডুবে যাওয়া। আর সেই অন্ধকারে কোনো এক রাজপ্রাসাদে থাকা এক প্রলিতারিয়ান রাজপুরুষের শেয়ালের ডাকে ঘুম না হওয়া। অন্ধকারের গল্প কিলবিল করে উঠলেই মাথায় ঘুরেফিরে আসে সেই সব ক্রান্তীয় ভূগোলের জ্যোতির্ময় নস্টালজিয়া। এখন আর সেই দিন নেই। কলকাতা শহরে এখন আঁধার নামেই না। এমনকী আজকের এই কার্তিকী অমাবস্যা তিথিতেও আলোর তোড়ে ভাসিয়ে দিচ্ছে শহর। দাপুটে দীপাবলিও তাঁর জৌলুসে অকৃপণ। চলুন যাই কলকাতা শহর ছেড়ে কয়েকশো কিলোমিটার দূরে যেখানে গা এলানো কংসাবতী বয়ে চলেছে দূরে মাথা তুলে দাঁড়ানো অযোধ্যা পাহাড়কে সামনে রেখে। কান পেতে শুনুন— মাদল বাজছে কোথাও। আহিরী গান হচ্ছে সমবেত সুরে। নাকাড়া, বাঁশিও বেজে উঠছে সঙ্গতে। চলুন আমরা নিশিযাপন করি এই অনাবাদি টাঁড়-জমিনের বুকে পুরুলিয়ার কোনো এক প্রত্যন্ত গ্রামে আনন্দের উৎসব বাঁধনা পরবে। বাঁদনা বা বাঁধনা যে নামেই ডাকা হোক না কেন, পশ্চিম সীমান্ত রাঢ় বাঙ্গলার এই পরবের রীতি আসলে শস্যদেবতার পাশাপাশি গো-দেবতাকেও পুজো করা। পরবের নামকরণ নিয়ে মতভেদ আছে— কেউ বলেন গো-বন্দনা থেকেই নামের উৎপত্তি, আবার কারোর কারোর মতে পরবে গোরু-মহিষকে খুঁটিতে বেঁধে নাচানো থেকে 'বাঁধনা' নামটার উৎপত্তি। লোকজ ভাষায় একে 'গোরু-খুটা' বা 'কাড়া-খুটা'-ও বলা হয়। পশ্চিম সীমান্তবর্তী রাঢ়-বাঙ্গলার কঠিন মাটির বুক চিরে ফসল ফলায় গোরু বা কাড়া অর্থাৎ শক্তপোক্ত পুরুষ মহিষ আর ষাঁড়েরা। এই পরব তাদেরই কৃতজ্ঞতা জানানো। তিথি অনুসারে আমাদের কালীপুজো বা দীপাবলির সঙ্গে যোগসূত্র থাকলেও বাঁদনা আসলে শস্যদেবী ধনলক্ষ্মীর অর্চনা। সীমান্ত বঙ্গে দীপাবলির কোনো ভূমিকা নেই। ওই দিন দীপ জ্বলে শুধু গোয়ালঘরেই। তিনদিন ব্যাপী উৎসব। সূচনাপর্ব—'জাগান'। এই দিনরাত জেগে গ্রামের পুরুষদের নাচ-গানের পালা। মেয়েরা ধান ভাঙবে ঢেঁকিতে। বাড়ির কর্তাকে জেগে থাকতে হয় সারা রাত। সন্ধ্যের আগেই গ্রাম দেবতা-বড়াম ঠাকুরের পুজো সেরে নেওয়া হয়। দ্বিতীয়দিন মূল পর্ব 'চুমান'। 'গো-দেবতার' পুজো। ঘরদোর পরিষ্কার করে আলপনা দেওয়ার পাশাপাশি ভাঙা গোয়ালে চাপানো হয়েছে খড়। গো-বন্দনার জন্য নতুন বাঁশে বোনা কুলোয় করে ফুলের মালা-তেল-সিঁদুর নিয়ে যাওয়া হয় গোয়ালে। এর কয়েকদিন আগে থেকেই গোরু-মহিষকে ভালো করে খাইয়ে দাইয়ে আদরযত্ন চলে। এরপর চালবাটা দিয়ে আঁকা উঠোন পেরিয়ে গোরুকে আনা হয় গোয়ালে। ধানের শিষের মুকুট পরানো হয়। ডাটাসমেত শালুক ফুল তুলে তার মালা গোরুর গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তেল-সিঁদুর ছোঁয়ানো হয় খুরে, কপালে দেওয়া হয় সিঁদুর আর হলুদের ফোঁটা। দেবতাকে সাজানোর পালা চলে। পিঠে তুলে দেওয়া হয় মুখে। গোশালায় জ্বলে ধুপধুনো বা প্রদীপ। এরপর শুরু হয় পুজো, অনুষঙ্গরূপে হয় মুরগি বলি। মহাভোজ সঙ্গে হাঁড়িয়া। ধুম লাগে নাচ গানের। সারা বছর গো-মহিষ যে কষ্ট সহ্য করে জোয়াল টেনেছে, দুধ দিয়েছে, এই ক'দিন তারই প্রতিদানের পালা। এই ক'দিন ওদের পূর্ণ বিশ্রাম, খাতির যত্নের চূড়ান্ত। আরতি করা হয় সন্ধ্যেয়। পুজো হয় লাঙল-জোয়ালেরও। পুজো শেষ হলে তুলে রাখা হয়। মকর সংক্রান্তির আগে ছোঁয়া হয় না।

গো-দেবতার পুজো প্রচলিত হয়ে আসছে কৃষি নির্ভর ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি কোনায় কোনায়। যেহেতু হিন্দু ধর্মের মূল নির্যাসই হলো 'The Divinity is not remote from us. It should inspire us to lead our lives in harmony with the infinite-to recognize our short existence on Earth as a part of the Eternal Whole.'। তাই আমাদের প্রায় প্রতিটি উৎসব বা পরবের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে জীবন, জীবিকা, প্রকৃতি আর পশুপাখি। পরবের মাধ্যমে যেমন এরা নিজেদের বিলিয়ে দেয় তেমনি সম্পর্ক গভীরও করে তোলে। ভারতের সমাজ জীবন সম্বন্ধে বড়ো চমৎকার কথা বলেছিলেন বিশ্বখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী Harold Garfinkel। তিনি বলেছেন, ''হিন্দু ওয়ে অব লাইফ হলো মানুষ এবং পশুর পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ বৃহত্তর গোষ্ঠীচেতনা সমৃদ্ধ সমাজজীবন যে শিক্ষাটা তাদের ধর্মীয় আচারেই নিবদ্ধ।''

মনটা চলে যায় সেই অযোধ্যা পাহাড়ে। পিছনে মিলিয়ে যাচ্ছে দিনের সূর্য। গুঁড়ি মেরে উঠে আসছে সন্ধ্যের ছায়াশরীর। হাই-টেনশন তারের গা ছুঁয়ে ঘরে ফিরছে পাখিরা। টিমটিম করে জ্বলে উঠছে দুটো একটা তারা। গোরু-মোষগুলোকে ধুইয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে গোয়ালে। বিকেলের উচ্ছ্বাস বিলীন হচ্ছে সন্ধ্যেয়। শরীরে একটা একটু করে শিকড় ছড়াচ্ছে আবছায়া রাত— কুয়াশার ঘোর লাগা বাতাস। Friedrich Nietzsche-এর ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে 'I am a forest, and a night of dark trees, but he who is not afraid of my darkness, will find banks full of roses under my cypresses.'

সভ্যতার জাগতিক মিথ্যেগুলোকে নস্যাৎ করে সভ্যতাদূরবর্তী গোলার্ধপ্রান্তে তখন নিঃশব্দ নামছে শিশিরের টুপ। ফসলকাটা খেতে আসন্ন অগ্রহায়ণ। ■

শতবর্ষের আলোকে পদ্মশ্রী ড. বিষ্ণু শ্রীধর বাকনকর

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী শহরের সুবিখ্যাত বাকনকর পরিবার বিগত আটটি প্রজন্ম ধরে (১৭০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে) এক পারিবারিক ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। এমনই এক পরিবারে ১৯১৯ সালে ৪ মে মধ্যপ্রদেশের নীমুচে জন্মগ্রহণ করেন ড. বিষ্ণু শ্রীধর বাকনকর।

এই পরিবারের সদস্যদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাঁরা যে বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, কর্মক্ষেত্রে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর কাজ করেছেন। তেমনি ড. বিষ্ণু শ্রীধর বাকনকর মুম্বইয়ের জি.ডি. আর্ট থেকে চিত্রকলা নিয়ে এম.এ এবং পি.এইচ.ডি করলেও তিনি পরবর্তীকালে ইতিহাস, প্রাচীন ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, প্রাচীন মুদ্রা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন এবং বিশ্ববিখ্যাত হন।

ড. বিষ্ণু শ্রীধর বাকনকরকে বলা হয় ভারতবর্ষের Rock Art School-এর পিতামহ। তিনি ১৯৫৪ সাল থেকে ভারতবর্ষে এবং অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন, গ্রিস, মেক্সিকো, ইজিপ্ট, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গুহাশিল্পের উপর পড়াশোনা ও গবেষণার কাজ করেন। তাঁর গবেষণা কাজের সঙ্গী ছিলেন ড. সুরেন্দ্রকুমার আর্য, ড. শ্রীমতী দলজিৎ খারে, ড. গিরিশচন্দ্র শর্মা, ড. জীতেন্দ্রদত্ত ত্রিপাঠী, ড. নারায়ণ ব্যাস, ড. গিরিরাজ, ড. শ্রীমতী ভারতী শ্রোত্রী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

ড. বাকনকর, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর বৃহত্তম গুহাপুঞ্জ (Cluster of rock shelter) 'ভীমবেটকা' পুনরাবিষ্কার করেন। মধ্যপ্রদেশের ভূপাল শহর থেকে ৫৫ কিলোমিটার দক্ষিণে রাইসেন জেলায় ভিয়ানপুর গ্রামে অবস্থিত এই ভীমবেটকা গুহা। তিনি অনুভব করেন এই গুহায় প্রাক্-ঐতিহাসিক মানব জীবনের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যেতে পারে। চোদ্দ বছর নিবিড় অনুসন্ধান ও খননকার্য করে আবিষ্কার করলেন এখানকার কিছু কিছু গুহা প্রায় এক লক্ষ বছরের পুরনো। গুহাচিত্রগুলির মধ্যে প্রাচীনতম গুহাচিত্রগুলির বয়েস দশ হাজার বছর। গুহাচিত্রগুলিতে ব্যবহৃত লাল রং খনিজ পাথর (Hematite) থেকে নেওয়া হয়েছে। এই গুহা ১৮৫০ হেক্টর জায়গা জুড়ে অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা রতাপানি (Ratapani Wild Life Senctuary) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ভূমিতে অবস্থিত। বহু ছোটো, বড়ো, মাঝারি আকৃতির গুহা রয়েছে এই বিন্ধ্য পর্বতমালায়। ভীমবেটকা গুহার অসামান্যতা হলো প্রস্তর যুগ থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক ৩০০ বছর আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষে মানব জীবনের ধারাবাহিকতা দেখতে পাওয়া যায়।

ড. বাকনকর ১৯৭১-৭২ সালে আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার বার্ষিক রিপোর্টে ভীমবেটকা গুহার গুহাচিত্রের কথা তুলে ধরেন। ২০০৩ সালে UNESCO ভীমবেটকা গুহাকে World Heritage Site বলে ঘোষণা করে। ড. বাকনকর ভারতবর্ষে চার হাজার গুহা পুনরাবিষ্কার করেন এবং তাদের উপর গবেষণা করেন। শুধু মাত্র ভারতবর্ষ নয়, তিনি ইউরোপ ও আমেরিকাতেও গুহাচিত্র আবিষ্কার করেন। তিনি গুহাচিত্রের সাড়ে সাত হাজার রেখাচিত্র অঙ্কন করেন, যা 'বাকনকর শোধ সংস্থান'-এ সংরক্ষিত আছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা : প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য ড. বাকনকর এবং তাঁর সহকর্মী ড. সচ্চিদানন্দ নাগদেব, মি. মুজাফ্‌ফর কুরেশী, মি. ওহিম গুট্টওয়ালা চম্বল ও নর্মদা নদীর সংকীর্ণ গিরিপথে অভিযান চালান এবং খননকার্য করেন মহেশ্বর (১৯৫৪), নভদা টৌলী (১৯৫৫), মানোতি (১৯৬০), ইন্দ্রগড় (১৯৫৯), কায়াথা (১৯৬৬), আজাদনগর (১৯৭৪), প্রভৃতি স্থানে। এমনকী সুদূর ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সেও প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য চালান।

মুদ্রাবিজ্ঞানী ও শিলালিপি বিশেষজ্ঞ : ড. বাকনকর, খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে শুরু করে সাড়ে পাঁচ হাজার প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ করেন এবং তার উপর গবেষণা করেন। উজ্জয়িনীতে ১৫,০০০ মুদ্রার উপর গবেষণার কাজ করেন। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও ব্রাহ্মী ভাষায় উৎকীর্ণ প্রায় ২৫০টি লিপিফলক সংগ্রহ করেন। এই সকল মুদ্রা ও লিপিফলক বর্তমানে বাকনকর শোধ সংস্থানের গর্বের সংগ্রহ হিসাবে সংরক্ষিত।

সরস্বতী নদীর গতিপথ চিহ্নিতকরণ : ড. বাকনকর, প্রত্নতত্ত্ব ও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নিয়ে নিরন্তর কাজ করে গেছেন। বর্তমানে লুপ্ত সরস্বতী নদীর গতিপথ খোঁজার জন্য কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে নিয়ে শুরু করেন 'সরস্বতী শোধ অভিযান' এবং প্রমাণ করেন সরস্বতী নদীর অস্তিত্বের কথা। তাঁর এই আবিষ্কার ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্বকে প্রতিষ্ঠা করে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো আবিষ্কারের পর ভারতীয় সভ্যতাকে সিন্ধুনদের তীরে গড়ে ওঠা সিন্ধুসভ্যতা বলে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু বৈদিক গ্রন্থে সরস্বতী নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যেখানে সরস্বতী নদীকে নদীমাতা বলে বর্ণনা করা আছে। তাই সরস্বতী নদীর যাত্রাপথের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা সিন্ধুসভ্যতার থেকেও প্রাচীন সারস্বত সভ্যতার প্রমাণ দেয়।

ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও প্রাচীন ঐতিহ্যের খোঁজে নিবেদিত প্রাণ ড. বাকনকরকে ভারত সরকার ১৯৭৫ সালে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত করে। তিনি উজ্জয়িনীতে 'Wakankar Indological/Cultural Research Trust'-এর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'Wakankar Bharati Sanskrit Anveshan Nyas'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ভারতী কলা ভবন ও রক আর্ট রিসার্চ সেন্টারের অধিকর্তা ছিলেন। তিনি অখিল ভারতীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন সংস্কার ভারতীর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ∎

মেদিনীপুরের গয়নাবড়ি

চূড়ামণি হাটি

জিলাপির প্যাঁচ দিয়ে আলপনার মতো অপূর্ব শ্বেতশুভ্র নকশি- বড়িই মেদিনীপুরের গয়না বড়ি নামে পরিচিতি পেয়েছে। চারধারে বড়ো বড়ো বাড়ি আর মধ্যে ছড়ানো উঠোন কিংবা মাথার উপর চওড়া ছাদ; সঙ্গে সহকারী অনেক ঝি-চাকর। এ সব কিছুকে কাজে লাগিয়ে বনেদিবাড়ির মেয়েরা বড়ির মতো খাদ্যবস্তু ঘিরে যে শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়েছিল, তা কর্মব্যস্ত সাধারণ পরিবারের মেয়েদের মন ছুঁয়েছিল। গয়নাবড়ি ধীরে ধীরে সর্বস্তরের মহিলা মহলের শখের বড়ি হয়ে উঠলো। বিবাহসূত্রে মেয়েদের এক স্থান থেকে আর এক স্থানে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গয়নাবড়ি তৈরির চর্চাটিরও বৃদ্ধি ঘটতে থাকলো। মূলকথা, মাতৃস্থানীয় কারোর কাছ থেকে এ কাজ শেখা।

গয়নাবড়ির রূপ দেখে ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। এমন শিল্পবস্তুকে হাঁ-মুখে ধ্বংস করতে অনেকেরই মন চায় না। সোনা নয়, সোলার গয়নার মতো তার রূপ। মেয়েদের কাছে গয়না এতটাই প্রিয় যে, ব্রতের আলপনা থেকে খাদ্যবস্তু, সবেতেই মনের গয়না নানা রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছে। ফুলকারি থেকে পশু-পাখির রূপ সবই গয়নার নকশা হিসেবে স্থান পেয়েছে। মেয়েদের হাতে তাদের নানা ভঙ্গি সহজেই ধরা দেয়। মাছ, প্রজাপতি, ময়ূর, হাঁস বিড়াল, শঙ্খ, ঘুঙুর, মুকুট, মটরমালা, রতনচূড় কত শত বিষয় ফুটে ওঠে সামান্য উপকরণ সঙ্গে নিয়েই। মেয়েদের জিনিস কিন্তু ছেলেরাও বড়ি দেয়।

বিরিকলাই বাটা হলো বড়ির মূল উপকরণ। বড়ি দেওয়ার আগের দিন সন্ধ্যায় যাঁতায় ভাঙা কিংবা গোটা বিরিকলাই ভিজিয়ে রেখে পরের দিন সকাল সকাল পুকুরঘাটে হাত দিয়ে ঘষে ঘষে খোসা ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। এরপর শুরু হয় শিল নোড়াতে ডাল বাটার কাজ। অল্প জলে মিহি করে বাটতে হয়। আঠা আঠা বাটা। একবারের পর দ্বিতীয়বার বাটাকে বলে পিনট। বেটে সঙ্গে সঙ্গে ফেটাতে পারলে ভালো। দীর্ঘ সময় ধরে ফেটাতে হয়। জলে এক চিমটে বাটা ফেলে দেখে নিতে হয়, যদি ভাসে তাহলে ফেটানোর কাজ আপাতত শেষ। কিন্তু বড়ি দেওয়ার সময়ও মাঝে মাঝে ফেটাতে হবে।

ছিলাসুদ্ধ বাঁশের বাতা সরু সরু কেটে তৈরি কাঠি পরপর রেখে বেশ চওড়া করে বোনা, যা চিক বা বার নামে পরিচিত। সহজ ভাবে বললে মাছধরার ঘুনির মতো মাদুর-চাটাই বিশেষ। বড়ি দেওয়ার সময় এর উপর তেল বুলিয়ে নেওয়া হয়। টান টান রাখার জন্য দু' প্রান্ত বাঁশ দিয়ে বাঁধা। আবার থালার পিঠেও বড়ি দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়া হয় মূলত পোস্ত কিংবা খোসা ছাড়ানো তিল। কড়া রোদে বড়ি ফেটে যেতে পারে, তাই সকালের হাল্কা রোদে বড়ি শুকোতে দেওয়া হয়। সবচেয়ে ভালো সময় শীতের সারাটাদিন। কার্তিক মাসে পোড়াষষ্ঠীর দিন আরম্ভ হয় বড়ি দেওয়া। মুঠোর ভেতর বুড়ো আঙুলের সাহায্যে গুল দেওয়ার মতো মুসুর-খেসারি-মটর কিংবা বিরিকলইয়ের সঙ্গে চালকুমড়ো বা তার বিচি মেশানো বড়িগুলি সাধারণ মানের। কাপড় কিংবা পাটা বা টিনের পিঠে তেল বুলিয়ে দিলেই হলো। চোখ পুঁটলির সাহায্যে গয়নাবড়ি তার রূপ পায়। সঙ্গে দ্রুত তালে একটানা হাতের নিয়ন্ত্রণ। টিন কিংবা পেতল কিংবা রুপো পেছনে-চ্যাপ্টা ভাঁজের চোঙ করিয়ে নেওয়া হয় ধাতুশিল্পীদের কাছ থেকে। মোটা, মাঝারি, সরু তিন মুখেরই চোঙ সঙ্গে রাখা হয়। আর ভুল সংশোধনের জন্য সঙ্গে রাখা হয় একটি সরু কাঠি। পুঁটলি হিসেবে বেছে নেওয়া হয় মোটা রুমাল আকৃতির কাপড়। মধ্যে চোঙ ঢোকানোর ছিদ্র পথ। এ ছিদ্র পথ শক্ত রাখতে চারধার সেলাই করা থাকে। মূল কাঠামো তৈরির জন্য বেছে নেওয়া হয় মোটা চোঙ আর আলংকারিক কাজ ফুটিয়ে তোলার জন্য কাজে লাগানো হয় ছোটো চোঙ। চারধার সেলাই করা ছিদ্র পথে চোঙ ঢুকিয়ে আর কাপড়ে ডাল বাটা নিয়ে হাতের মুঠোর চাপে নলপথে বেরিয়ে আসা ডাল বাটা হাতের নড়াচড়ায় নকশারূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়। প্যাঁচ তোলার কৌশলেই গয়না বড়ি নানা রূপে। কিন্তু হালকা ও ভঙ্গুর। গয়নাবড়ির প্যাঁচে প্যাঁচে রূপের উঁকি ঝুঁকি। ঝোল, ঝাল, অম্বল, শুক্তো, চচ্চড়ি, পোস্ত সবেতেই বড়ি। ডাল-ভাতের সঙ্গে বড়ি ভাজা এমনকী চায়ের সঙ্গেও বড়ি ভাজার চল আছে।

গয়না বড়ির চল মেদিনীপুর জেলার তমলুক, ঘাটাল, কাঁথি, মহিষাদল, সুতাহাটা-সহ অনেক স্থানেই ছড়িয়ে পড়েছে। আর এর রূপ নাম ছড়িয়ে পড়েছে আরও বহু দূর। সে সূত্র ধরে আলোচিত হয়েছে ২১ মাঘ ১৩৪১ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠিতে বড়ি শিল্পী তমলুকের লাক্ষা গ্রামের শরৎকুমারী মাইতির নাম। নানা জনের আলোচনায় উঠে আসে মাহিষ্য হিন্দু সম্প্রদায়ের কথা। ময়নাগড় রাজবাড়ির পাশাপাশি তমলুক-মাতঙ্গিনী রেললাইন ধারের বাসিন্দা রেণুকা মণ্ডলের কথা। আবার বড়ো কথা, বড়ি দেওয়াকে কেন্দ্র করে জড়িয়ে আছে নানা কৌতুক, রসবোধ এবং লোকাচার, সংস্কার। মূলকথা, এক ঘেঁয়েমিকে দূর করার আনন্দ আছে এ শিল্পকে ঘিরে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

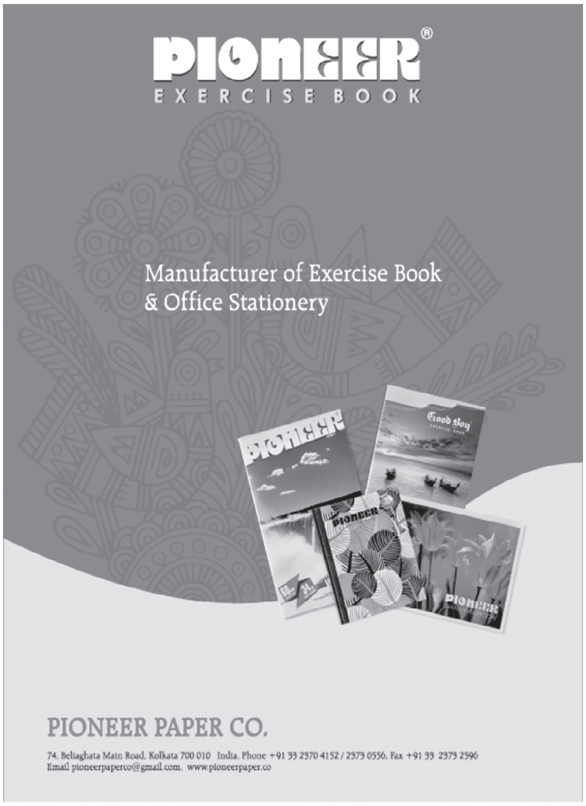

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,

মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

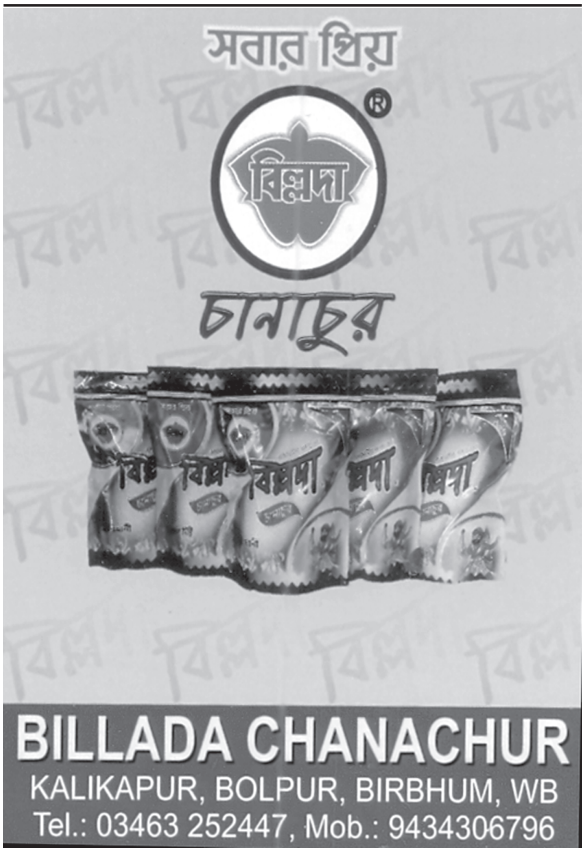

অযোধ্যায় আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে শ্রীরামচন্দ্রের ভব্য মন্দির

ড. প্রণব বর

'কোটি কোটি হিন্দুজনের জোয়ার এনেই থামবো।
সৌভাগ্য রামপথগামী মোরা মন্দির ওখানেই বানাবো।'

ভারতবাসী এই সংকল্প কয়েকশো বছর ধরে হৃদয়ে পোষণ করে এসেছে। যদি দেশের ভূমি অপহৃত হয়ে যায় তবে শৌর্য তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে। যদি ধনসম্পদ নষ্ট হয় তবে পরিশ্রম করে তা পুনরায় উপার্জন করা যায়, যদি রাজত্ব চলে যায় তবে পরাক্রম তা ফিরিয়ে আনতে পারে। কিন্তু যদি দেশের চেতনা ঘুমিয়ে পড়ে তবে দেশ তার পরিচয়ই হারিয়ে ফেলে। তখন কোনো শৌর্য, কোনো পরিশ্রম অথবা কোনো পরাক্রমই তা ফিরিয়ে আনতে পারে না। সে কারণে দেশের সুসন্তানেরা ভীষণ ও বিরূপ পরিস্থিতিতেও, সহস্র প্রতিকূলতার মধ্যেও দেশের এই চেতনাকে জাগিয়ে রেখেছে। সেই রাষ্ট্রের চেতনা ও পরিচয়কে বাঁচিয়ে রাখার প্রতীক হলো রামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণের সঙ্কল্প।

গৌরবময় অযোধ্যা : অযোধ্যার গৌরব গাথা অত্যন্ত প্রাচীন। অযোধ্যার ইতিহাস ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাস। অযোধ্যা সূর্যবংশীয় রাজাদের রাজধানী ছিল। এই বংশেই মহারাজা সগর, ভগীরথ, সত্যবাদী হরিশ্চন্দ্রের মতো মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। এই মহান পরম্পরায় প্রভু শ্রীরামেরও জন্ম হয়েছে। পাঁচজন জৈন তীর্থঙ্করের জন্মভূমিও অযোধ্যা। গৌতমবুদ্ধের তপস্থলী দন্তধাবন কুণ্ডও অযোধ্যার সীমার মধ্যে। গুরু নানকদেব অযোধ্যা এসে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্যস্মরণ ও দর্শন করেছিলেন। অযোধ্যাতে ব্রহ্মকুণ্ড গুরুদ্বার অবস্থিত। মর্যাদা পুরুষোত্তম প্রভু শ্রীরামের জন্মস্থান হওয়ার জন্য সপ্তপুরীর এক পুরী অযোধ্যাতেই অবস্থিত ও প্রখ্যাত। সরযুতটে নির্মিত সুপ্রাচীন ঘাট শ্রীরামচন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান হিন্দুদের আস্থার প্রতীক। অযোধ্যা হলো মন্দির নগরী। বহু মন্দির আছে এখানে এবং প্রায় সবই রামচন্দ্রের। বিশ্বপ্রসিদ্ধ স্বিটস্বর্গ এটলাসে বেদকালীন, মহাভারতকালীন, অষ্টম থেকে দ্বাদশ সপ্তদশ শতকের মানচিত্র সংরক্ষিত আছে। এই সকল মানচিত্রে অযোধ্যাকে ধর্মীয় নগরীরূপে দেখানো হয়েছে। এই মানচিত্র অযোধ্যার প্রাচীনতা ও ঐতিহাসিক মহত্ত্বকে প্রমাণিত করে। সব সম্প্রদায়ই এটা মেনে নিয়েছে যে বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণিত অযোধ্যা এটাই।

বৈদেশিক আক্রমণ ও তার প্রতিকার : শ্রীরামজন্মভূমির ওপর কোনো এক সময় ভব্যমন্দির বিদ্যমান ছিল। মধ্যযুগে ধর্মীয় অসহিষ্ণু, অত্যাচারী, ইসলামিক আক্রমণকারী বাবরের ক্রূরপ্রহারে জন্মস্থানের উপর সহস্র বছর ধরে দাঁড়িয়ে থাকা সুপ্রাচীন মন্দিরটি ধূলিসাৎ হয়ে যায়। আক্রমণকারী বাবরের আদেশে তার সেনাপতি মির বাকি সেই প্রাচীন মন্দিরকে ভেঙে, সেখানেই এক মসজিদের মতো এক ধাঁচা বানিয়ে ফেলে। ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দের এই কুকার্যের দ্বারা হিন্দু সমাজের মাথায় এক দৃঢ় কলঙ্কের চিহ্ন অঙ্কিত হয়ে যায়। শ্রীরাম জন্মস্থানের ওপরে মন্দির পুনর্নির্মাণের দ্বারা সেই কলঙ্ককে মুছে ফেলার এবং আমাদের আস্থাকে রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে আগামী প্রজন্মকে প্রেরণা দেবার জন্য এটি অত্যন্ত আবশ্যক। এই স্থানটিকে ফিরে পেতে অবধের হিন্দুরা ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে নিরন্তর লড়াই করে এসেছে। ১৫২৮ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত জন্মভূমিকে ফিরে পেতে ৭৬ বার যুদ্ধ হয়েছে। এই যুদ্ধে হিন্দু সমাজের পূর্ণ সফলতা নাই বা মিলুক, কিন্তু সমাজ কখনো সম্পূর্ণ পৌরুষ হারিয়ে ফেলেনি। আক্রমণকারীকে কখনো নিশ্চিন্তে থাকতে

দেয়নি। বার বার লড়াই করে জন্মভূমিতে নিজেদের অধিকার কায়েম করে এসেছে। প্রত্যেক লড়াইয়ে জন্মভূমিকে ফিরে পেতে এক এক পদক্ষেপ অগ্রসর হয়েছে তারা। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধ বিশ্ববিখ্যাত। যখন অযোধ্যার নাগরিকরা বিতর্কিত অপমানকর কাঠামোর বড়োসড় ক্ষতি করে। এই সকল সংঘর্ষে লক্ষ লক্ষ রামভক্ত সর্বস্ব সমর্পণ করে আত্মাহুতি দিয়েছেন। ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর এই নিরন্তর সংঘর্ষেরই অন্তিম পরিণতি। যখন পরাধীনতার প্রতীক তিন গম্বুজওয়ালা মসজিদের ধাঁচা ধুলিসাৎ হয় এবং প্রভু শ্রীরামের জন্মভূমিতে তাঁরই ভব্যমন্দির নির্মাণের পথ খুলে যায়।

পর্যটক পাদরির ডায়েরি : হিন্দুদের আরাধ্য দেবতা শ্রীরামজন্মস্থানের মন্দির ভেঙে সেখানে মসজিদের ধাঁচা বানানোর বর্ণনা অনেক বিদেশি লেখক ও পর্যটক করেছেন। ফাদার টাইপেন্থলরের ভ্রমণবৃত্তান্ত এর জলজ্যান্ত প্রমাণ। অস্ট্রেলিয়ার এই পাদরি ৪৫ বছর ধরে (১৭৪০-১৭৮৫ খ্রিঃ) ভারত ভ্রমণ করেছেন এবং তা নিজের ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠা জুড়ে তিনি অবধের বর্ণনা করেছেন, তাতে রামকোটে তিন গম্বুজওয়ালা এক ধাঁচা বিদ্যমান, তাতে চৌদ্দটি কালো কষ্টিপাথরের স্তম্ভ । এই স্থানেই শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁর তিন ভাই জন্মগ্রহণ করেন। জন্মভূমিতে অবস্থিত মন্দিরটিকে বাবরই ধ্বংস করিয়েছিল। আজও হিন্দুরা সেখানে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে, পরিক্রমা করে থাকে ইত্যাদির বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

রামলালার মূর্তি স্থাপন : ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর। সেই রাত্রে দেখা যায় কে বা কারা সেই ধাঁচার ভিতর রামলালার মূর্তি স্থাপন করেছেন। জওহরলাল নেহরু সেই সময় দেশের প্রধানমন্ত্রী, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ এবং ফৈজাবাদের জেলাশাসক কে. কে নায়ার। নায়ারসাহেব ধাঁচার সামনের দেওয়ালে লোহার গ্রিল বসিয়ে তালা দেওয়ার আদেশ দেন। রামলালার পূজার জন্য পূজারিও নিযুক্ত হয়। পূজারি রোজ সকাল-সন্ধ্যায় পূজার জন্য ভিতরে যেতেন। ভক্তরা এভাবেই গ্রিলের বাইরে থেকে পূজা করতেন। অনেক ভক্ত সেখানে কীর্তন করতে বসে যান। ১৯৯২-র ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ওই স্থানে সেভাবেই পুজাপাঠ চলতে থাকে।

তালা খোলা হলো : ১৯৮৪ সালের ৮ এপ্রিল দিল্লির বিজ্ঞানভবনের সমাবেশে সাধুসন্তরা তালা খোলার সংকল্প গ্রহণ করেন। এই সভাকেই প্রথম ধর্মসংসদ বলা হয়। শ্রীরাম-জানকী রথযাত্রার মাধ্যমে ব্যাপক জনজাগরণ হয়। ফৈজাবাদের জেলা ন্যায়াধীশ কে. এম. পাণ্ডে ১৯৮৬-র ১ ফ্রেব্রুয়ারি তালা খোলার আদেশ দেন। সে সময় উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন কংগ্রেসের বীরবাহাদুর সিংহ।

রাম শিলাপূজন ও শিলান্যাস : মন্দিরের নির্মাণের পরিকল্পনা ও নকশা তৈরি হয়। আহমেদাবাদের বিশিষ্ট মন্দির-নির্মাণ শিল্পী সি. বি. সোমাপুরা প্রস্তাবিত মন্দিরের নকশা তৈরি করেন। তাঁরই পিতামহ সোমনাথ মন্দিরের নকশা নির্মাণ করেছিলেন। মন্দির নির্মাণের জন্য ১৯৮৯ সালে প্রয়াগরাজে কুম্ভমেলায় পূজ্য দেওরাহা বাবার উপস্থিতিতে গ্রামে-গ্রামে রামশিলা পূজন করার সিদ্ধান্ত হয়। পৌনে তিন লক্ষ শিলা পূজিত হয়ে অযোধ্যায় পৌঁছয়। বিদেশে বসবাসকারী হিন্দুরাও মন্দির নির্মাণের জন্য পূজিত শিলা অযোধ্যায় পাঠান। পূর্বনির্ধারিত তারিখ ১৯৮৯ এর ৯ নভেম্বরে সর্ব বাধা পার করে সবার সহমতে মন্দিরের শিলান্যাস বিহার নিবাসী কামেশ্বর চৌপালের হাতে সম্পন্ন হয়। তখন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন কংগ্রেসের নারায়ণ দত্ত তিওয়ারী , ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুটা সিংহ এবং প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী।

প্রথম করসেবা : ১৯৯০ সালের ২৪ মে হরিদ্বারে বিরাট হিন্দু সম্মেলন হয়। সাধুসন্তরা ঘোষণা করেন যে দেবোত্থান একাদশী (৩০ অক্টোবর, ১৯৯০) তে করসেবা আরম্ভ হবে। এই খবর গ্রাম গ্রামান্তরে ছড়িয়ে দিতে ১ সেপ্টেম্বর অযোধ্যাতে অরণি মন্থনের দ্বারা রামাজ্যোতি প্রজ্বলিত করা হয়। সেবছর দীপাবলী ছিল ১৮ অক্টোবর। তার আগেই দেশের লক্ষ লক্ষ গ্রামে রামজ্যোতি পৌঁছে দেওয়া হয়। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিংহ সদম্ভ ঘোষণা করেন যে, অযোধ্যায় একটি পাখিকেও প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। তিনি অযোধ্যার দিকে যাওয়ার সকল রাস্তাই বন্ধ করে দেন। অযোধ্যাগামী সব রেলগাড়ি বাতিল করা হয়। ২২ অক্টোবরের আগেই সারা অযোধ্যা সেনা ব্যারাকে বদলে গেল। ফৈজাবাদ জেলার সীমা থেকে রামজন্মভূমি পর্যন্ত পৌঁছাতে গেলে সাত সাতটি পুলিসের বেষ্টনী পার করতে হচ্ছিল। তাসত্ত্বেও রামভক্তরা ৩০ অক্টোবরে বানরের মতো গম্বুজের উপরে উঠে গৈরিক ধ্বজ উড়িয়ে দিয়েছিল। উত্তরপ্রদেশ সরকার ১৯৯০ সালের ২ নভেম্বর ভয়ংকর নরসংহার করে। কলকাতা থেকে রাম কোঠারী ও শরদ কোঠারী নামে দুই সহোদর ভাই করসেবার জন্য অযোধ্যা গিয়েছিলেন। তাদের এক জনকে ঘর থেকে টেনে বের করে মাথায় গুলি করে মারা হয়। ছোটভাই দাদাকে রক্ষা করতে গেলে তাঁকেও মাথায় গুলি করে মারা হয়। কত লোককে হত্যা করা হয়েছিল তার কোনো ইয়ত্তা নেই। সমগ্র দেশ রাগে ফুঁসতে থাকে। করসেবকেরা ফিরে যায়। কয়েক দিন নিরন্তর সত্যাগ্রহ চলে। হুতাত্মা করসেবকদের অস্থিভস্ম সমগ্র দেশে পূজিত হয়। ১৯৯১ সালের ১৪ জানুয়ারি মাঘমেলাতে প্রয়াগরাজ সঙ্গমে তাঁদের অস্থিভস্ম প্রবাহিত করা হয়। মন্দির নির্মাণের সঙ্কল্প আরও মজবুত হয়। ঘোষণা করা হয় সরকার রামমন্দিরের দাবি মেনে নিক অথবা সরে যাক।

বিরাট শক্তি প্রদর্শন : ১৯৯২-এর ৪ এপ্রিল দিল্লির বোট ক্লাবে বিশাল সমাবেশ হয়। সারা দেশ থেকে ২৫ লক্ষ রামভক্ত দিল্লি পৌঁছয়। এটিই ভারতের ইতিহাসে বিশালতম সমাবেশ বলে উল্লেখ করা হয়। এই সমাবেশের বিশালতা দেখে বোট ক্লাবে সভা সমাবেশ করাই নিষিদ্ধ করা হয়। সমাবেশে সাধুসন্তদের সিংহগর্জন চলছিল। তখনই খবর আসে যে উত্তরপ্রদেশ থেকে মুলায়ম সিংহ মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। এর ফলে শ্রীরামজন্মভূমি প্রসঙ্গে দেশের জনাদেশ প্রাপ্ত হয়ে গেল। উত্তরপ্রদেশে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে শ্রীরামজন্মভূমি মন্দিরের বিরোধীরা পরাজিত হয়। মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ নেন কল্যাণ সিংহ।

জমির সমতল প্রক্রিয়া : শ্রীরাম জন্মভূমি ন্যাস উত্তরপ্রদেশ সরকারের কাছে রামকথা কুঞ্জের জন্য স্থান প্রার্থনা করে। মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংহ ৪২ একর ভূমি শ্রীরাম কথাকুঞ্জের জন্য রামজন্মভূমি ন্যাসকে প্রদান করেন। এই জায়গা বাবরি ধাঁচার পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। উত্তরপ্রদেশ সরকারও ২.৭৭ একর ভূমি তীর্থযাত্রীদের জন্য অধিগ্রহণ করে। ১৯৯১ সালের জুন মাসে যখন রাজ্য সরকারের তরফে যখন সেই এবড়ো খেবড়ো ভূমি সমতল করার কাজ চলছিল তখন ধাঁচার দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ভূমিতে অনেক শিলাখণ্ড পাওয়া গেল, যাতে শিব-পার্বতীর ভাঙা মূর্তি, সূর্যের মতো অর্ধকমল, মন্দির শিখরের আমলক, উৎকৃষ্ট কারুকার্য খচিত প্রস্তররাজি ছিল।

সর্বদেব অনুষ্ঠান এবং ভিত্তি স্থাপন : ১৯৯২ সালের ৯ জুলাই থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সর্বদেব অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। জন্মভূমির ঠিক সামনে শিলান্যাস স্থানে ভাবী মন্দিরের চবুতরার ভিত্তি ঢালাইয়ের কাজ আরম্ভ হয়। ১৫ দিন পর্যন্ত ঢালাইয়ের কাজ চলে। প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও

সাধুসন্তদের কাছে কিছুটা সময় চেয়ে নেন এবং ভিত্তি ঢালাইয়ের কাজ বন্ধ রাখার আবেদন করেন। সাধুসন্তরা প্রধানমন্ত্রীর কথা মেনে নেন এবং অনতিদূরে শেষনাগের মন্দির ঢালাইয়ের কাজে লেগে যান। ওই ভিত্তি ২৯০ ফুট লম্বা, ১৫৫ ফুট চওড়া এবং ২—২ ফুট মোটা একটির উপর আর একটি তিন পরতে ঢালাই করে মোট ছয় ফুট মোটা তৈরি করা হয়।

পাদুকা পূজন : রামানুজ ভরত নন্দীগ্রামে ১৪ বছর বনবাসী রামচন্দ্রের প্রতিনিধি রূপে রাজ্যশাসন রামচন্দ্রের পাদুকার মাধ্যমে করেছিলেন। সেই স্থানেই ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ সালে রামচন্দ্রের পাদুকা পূজন হয়। অক্টোবরেই দেশের গ্রামে গ্রামে এই পাদুকার পূজনের দ্বারা জনজাগরণ করা হয়। সেখানে রামভক্তেরা মন্দির নির্মাণের সংকল্প নেন।

দ্বিতীয় করসেবা : দিল্লিতে ১৯৯২-এর ৩০ অক্টোবর সাধুসন্তরা পুনরায় একত্রিত হন। সেটি ছিল পঞ্চম ধর্মসংসদ। সাধুসন্তরা পুনরায় ঘোষণা করলেন যে গীতাজয়ন্তীর দিন (৬ ডিসেম্বর) থেকে করসেবা আরম্ভ হবে। সন্তদের আহ্বানে লক্ষ লক্ষ রামভক্ত অযোধ্যায় পৌঁছন। সেদিন রামভক্তরা রোষ ফেটে পড়ে কলঙ্কিত ধাঁচাকে পুরোপুরি ধুলিসাৎ করেই শান্ত হন।

ধাঁচা থেকে প্রাপ্ত শিলালিপি : ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ যখন সেই ধাঁচা ভেঙে পড়ছিল তখন তার দেওয়াল থেকে শিলালিপি পাওয়া গেল। বিশেষজ্ঞেরা পড়ে বললেন এই শিলালিপি ১১৫৪ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃততেই লেখা। তাতে ২০টি পঙ্ক্তি আছে। 'ওঁ নমঃ শিবায়' দিয়ে এই শিলালিপি আরম্ভ হয়েছে। বিষ্ণুহরির স্বর্ণকলস যুক্ত মন্দিরের এতে বর্ণনা আছে। অযোধ্যার সৌন্দর্যের বর্ণনা আছে। দশাননের মানমর্দনকারী শ্রীরামের বর্ণনা এতে আছে। এই সমস্ত পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য কোনো এক সময় ওই স্থানে বিরাজমান সুন্দর ও বিরাট মন্দিরের অস্তিত্বকেই প্রমাণ করে।

সংবিধান নির্মাতাদের দৃষ্টিতে শ্রীরাম : ভারতীয়দের দৃষ্টিতে শ্রীরাম আদর্শ পুরুষ। সংবিধানের নির্মাতারাও যখন সংবিধানের প্রথম খসড়া প্রকাশ করলেন তখন তাতে ভারতের সংস্কৃতি এবং ঐতিহাসিক প্রাচীনতাকেই প্রদর্শিত করেছেন। সংবিধানের এই খসড়ায় প্রভু শ্রীরাম, মাতা জানকী ও লক্ষ্মণের লঙ্কাবিজয় করে পুষ্পক বিমানে অযোধ্যা ফিরে আসার চিত্র রয়েছে। সংবিধান প্রণয়ন সভায় সব মত ও পন্থের লোক ছিলেন, কেউ কোনো আপত্তি করেননি। নিশ্চয় সকলের সহমতেই সেই চিত্র ছাপা হয়েছিল। এই সংবিধানে বৈদিক কালের গুরুকুল, কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে বিষাদযুক্ত অর্জুনকে প্রেরণা দানরত শ্রীকৃষ্ণ, গৌতমবুদ্ধ, মহাবীর স্বামী প্রমুখ ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ পুরুষদের চিত্র স্থান পেয়েছে। তাই মর্যাদাপুরুষোত্তম প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থানকে রক্ষা করা ভারতবাসীর সংবিধানিক দায়িত্বও বটে।

হস্তাক্ষর অভিযান : ১৯৯৩ সালে ১০ কোটি নাগরিকের হস্তাক্ষরযুক্ত পত্র তৎকালীন মহামহিম রাষ্ট্রপতিকে অর্পণ করা হয়। তাতে এক পংক্তির সঙ্কল্প বাক্য লিখিত ছিল যে—''আজ যে স্থানে রামলালা বিরাজমান , ওই স্থানই হলো শ্রীরাম জন্মভূমি। এটি আমাদের আস্থার প্রতীক এবং সেখানেই আমরা এক ভব্য রামমন্দির নির্মাণ করবো।''

অস্থায়ী মন্দির নির্মাণ : ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর সেই ধাঁচা ভেঙে পড়ার পর, তৎকালীন মধ্যবর্তী গম্বুজের স্থানে রামলালার সিংহাসন এবং ধাঁচার নীচে পারম্পরিক ভাবেই রক্ষিত বিগ্রহ সিংহাসনে স্থাপন করে পূজা আরম্ভ হয়ে যায়। হাজার হাজার ভক্ত দিনরাত ৩৬ ঘণ্টা পরিশ্রম করে, কোনো রকম উপকরণ ছাড়াই, কেবল মাত্র হাতের দ্বারা চার কোণে চারটি খুঁটি খাড়া করে তাঁবু লাগিয়ে ৫ ফুট উঁচু, ২৫ ফুট লম্বা, ২৫ ফুট চওড়া, ইটের দেওয়াল খাড়া করে দিলেন। এভাবে তৈরি হয়ে গেল অস্থায়ী মন্দির। আজও এই স্থানে পূজা হয়ে চলেছে। এখন একে ভব্য রূপ দিতে হবে।

আদালত পুনরায় দর্শনের অনুমতি দিল : ১৯৯২ সালের ৮ ডিসেম্বর অতি প্রভাতেঅযোধ্যা জুড়ে পুনরায় কার্ফু জারি হয়ে গেল। রামজন্মভূমি পরিসর কেন্দ্রীয় সুরক্ষা বাহিনীর হাতে চলে গেল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সুরক্ষা জওয়ানরা রামলালার পূজা করতে থাকলেন। হরিশঙ্কর জৈন নামে এক উকিল উচ্চ ন্যায়ালয়ে আবেদন করলেন যে, ভগবান অভুক্ত আছেন। ভোগ-রাগ ও পূজার অনুমতি দেওয়া হোক। ১৯৯৩ সালে ১ জানুয়ারি উচ্চ ন্যায়ালয়ের ন্যায়াধীশ বিচারপতি হরিনাথ তিলহারী দর্শন ওপূজনের অনুমতি প্রদান করলেন।

জমি অধিগ্রহণ এবং দর্শনের পীড়াদায়ক প্রশাসনিক ব্যবস্থা : ১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারি ভারত সরকার জন্মস্থানের চারদিক ঘিরে দিয়ে প্রায় ৬৭ একর ভূমি অধিগ্রহণ করে নিল। এই ভূমির চারিদিকে লোহার পাইপের উঁচু উঁচু দুটি পাঁচিল খাড়া করে দেওয়া হলো। রামলালার কাছে পৌঁছানোর জন্য বহু সংকীর্ণ গলিপথ নির্মাণ করা হলো। দর্শনকারীদের কড়া তল্লাশি

করা হতে থাকলো, জুতো পরেই দর্শন করতে হতো। আধ মিনিটও সেখানে দাঁড়াতে দেওয়া হতো না। বর্ষা রৌদ্র শীত থেকে রক্ষার জন্য সেখানে কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এই সমস্ত কষ্টের কারণে কোনো অধিক বয়স্ক ভক্ত সেখানে দর্শন করতে যেতে পারতেন না। নিজের ইচ্ছানুযায়ী প্রসাদ নিয়ে যেতে পারতেন না। যে প্রসাদ সরকারের তরফে নিয়ে যাবার অনুমতি দিত সেই প্রসাদ নিয়ে যেতে হতো। দর্শনের এই অবস্থা অত্যন্ত পীড়াদায়ক ছিল।

ভাবী মন্দিরের কার্যশালা : শ্রীরাম জন্মভূমিতে মন্দির কেবলমাত্র পাথর দিয়ে নির্মিত হবে। সিমেন্ট বা কংক্রিট দিয়ে নয়। মন্দিরে লোহার ব্যবহার হবে না। এমনকী মন্দিরের ভিতেও নয়। মন্দির দ্বিতল হবে, ভূতলে রামলালা ও প্রথম তলে রাম দরবার হবে। সিংহদ্বার, নাটমন্দির, রঙ্গমণ্ডপ, গর্ভগৃহ, পরিক্রমা ইত্যাদি মন্দিরের অঙ্গ। ১০৬ স্তম্ভ থাকবে। ৬ ফুট মোটা পাথরের দেওয়াল হবে। দরজার চৌকাঠ শ্বেতপাথরের হবে। ১৯৯৩ থেকেই মন্দির নির্মাণের কাজের গতি বৃদ্ধি করা হয়। মন্দিরের পাথরের নক্সা করার জন্য অযোধ্যা, রাজস্থানের পিছবাড়া ও মকরানায় কার্যশালা স্থাপিত হয়। এখনো পর্যন্ত মন্দিরের মেঝেতে লাগানোর জন্য সমস্ত পাথর তৈরি হয়ে গেছে। ভূতলে লাগানো হবে এরকম ১৬.৬ ফুটের ১০৮ স্তম্ভ তৈরি হয়ে গেছে। রঙ্গমণ্ডপ, গর্ভগৃহের দেওয়াল, ভূতলে ব্যবহারের এবং শ্বেতপাথরের চৌকাঠের পাথরের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। স্তম্ভের উপরে রাখা হবে এরকম ১৮৫ বিমের মধ্যে ১৫০টি তৈরি হয়ে গেছে। মন্দিরের প্রয়োজনীয় ৬০ শতাংশ পাথর এসে গেছে।

আমাদের এটা বুঝে নিতে হবে যে রাম জন্মভূমি কোনো সম্পত্তি নয়। হিন্দুদের জন্য শ্রীরামজন্মভূমি হলো একটি শ্রদ্ধাকেন্দ্র। ভগবানের জন্মভূমি স্বয়ং এক দেবতা। সেটি একটি তীর্থ, একটি ধাম। রামভক্ত এই ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে। এই বিবাদ কোনো সম্পত্তির বিবাদ নয়। এজন্য এটি আদালতেরও বিষয় নয়।

আদালতের প্রক্রিয়া : শ্রীরাম জন্মভূমির জন্য প্রথম বিচার প্রার্থনা হিন্দুদের পক্ষ থেকে ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে জেলা আদালতে করা হয়েছিল। দ্বিতীয় মামলা ১৯৫৯ সালে রামানন্দ সম্প্রদায়ের নির্মোহী আখড়ার পক্ষ থেকে করা হয়েছিল। সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের তরফ থেকে ১৯৬১ সালে তৃতীয় মামলা দায়ের করা হয়। ৪০ বছর পর্যন্ত ফৈজাবাদের জেলা আদালতে এই মামলা এমনি এমনি পড়ে ছিল। ১৯৮৯ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টের ন্যায়াধীশ দেবকীনন্দন অগ্রবাহ (বর্তমানে লোকান্তরিত) নিজেকে রামলালা ও রামজন্মভূমির বাদি বলে ঘোষণা করে আদালতে মামলা দায়ের করেন। মামলা গ্রহণ করাও হয়। সব মামলা একটিমাত্র স্থানকে (রাম জন্মভূমি) কেন্দ্র করে, তাই সবকটিকে এক সঙ্গে জুড়ে একই আদালতে শুনানির জন্যেও আদেশ দেওয়া হয়। বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে সমস্ত মামলাকে জেলা আদালত থেকে উঠিয়ে নিয়ে উচ্চআদালতের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চকে দিয়ে দেওয়া হয়। দুজন হিন্দু ও একজন মুসলমান ন্যায়াধীশের বেঞ্চ তৈরি হলো। এই বেঞ্চে কুড়ি বছর ধরে এই বিচারপর্বের শুনানি চলেছে।

মহামহিম রাষ্ট্রপতির প্রশ্ন এবং উৎখনন থেকে প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষ : ১৯৯৩ সালে ধাঁচা ভেঙে পড়ার পরে, ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের কাছে সংবিধানের ১৪৩ নং ধারার অন্তর্গত এক প্রশ্ন পেশ করেন এবং সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়কে তার উত্তর দিতে বলেন। প্রশ্ন ছিল যে—'ধাঁচার স্থানে ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দের আগে কোনো হিন্দু মন্দির ছিল কি?' সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব উচ্চন্যায়ালয়ের উপরে ছেড়ে দিলেন। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের নিজের এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজ করাই উচিত ছিল।

যদি ১৫২৮ সালে মন্দির ভেঙে ফেলা হয় তবে তার ভগ্নাবশেষ মাটির নীচে অবশ্যই চাপা পড়ে আছে, তা খোঁজার জন্য উচ্চন্যায়ালয় স্বয়ং প্রেরিত হয়ে ২০০৩ সালে রাডার তরঙ্গের দ্বারা জন্মস্থানের মাটির নীচের ছবি তোলান। ছবি বিশেষজ্ঞ কানাডা থেকে আসেন। তিনি তাঁর রিপোর্টে লিখলেন কোনো সৌধের অবশেষ দূরদূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। রিপোর্টকে প্রমাণিত করার জন্য খনন করার আদেশ দেওয়া হয়। ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ খননকার্য শুরু করে। খননের রিপোর্ট ফোটোগ্রাফি রিপোর্টের সঙ্গে মিলে যায়। খননের ফলে ২৭টি দেওয়াল, দেওয়ালে লাগানো নকশাযুক্ত পাথর, প্লাস্টার, চারটি মেঝে, দুটি পঙক্তিতে ৫২টি স্থানে স্তম্ভের নীচের ভিতের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, একটি শিবমন্দির পাওয়া যায়। উৎখননকারী এক বিশেষজ্ঞ লিখেছেন যে, উত্তর ভারতীয় শৈলীর কোনো মন্দির কখনো অবশ্যই ছিল। সব তথ্য আদালতের রেকর্ডে জমা রয়েছে।

আলাপআলোচনার ইতিহাস : অনেকেই আলাপ আলোচনা করে বিবাদের নিষ্পত্তি করে নিতে বলেছেন। তাদের জানা উচিত ছিল যে, আলাপ আলোচনাও হয়েছিল। রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বের কালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীবুটা সিংহ আলাপআলোচনা করাতেন। প্রত্যেক মিটিঙে আলাপ আলোচনার বিষয়ই বদলে যেত। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের প্রধানমন্ত্রিত্বের কালে এক আলোচনার দিন শুক্রবার ছিল। মুসলমান পক্ষের লোক দুপুর বেলা নামাজ পড়তে চলে গেলেন। ফিরে এলে স্বামী সত্যামিত্রানন্দজী মহারাজ উঠে দাঁড়িয়ে নিজের বস্ত্রাঞ্চল প্রসারিত করে বললেন—''আমি আপনাদের কাছে শ্রীরামজন্মভূমি ভিক্ষা চাইছি। নামাজের পর জাকাত (দান) দিতে হয়, আপনারা আমাকে জাকাত দিয়ে দিন। সেখানে বসে থাকা মুসলমান পক্ষের লোকেরা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেন যে, ''এটা কি কোনো দেশলাই বক্স যে দিয়ে দেওয়া যায়।'' একবার সৈয়াদ সাহাবুদ্দিন সাহেব স্বয়ং বলেছিলেন, যদি এটা প্রমাণিত হয়ে যায় যে কোনো মন্দিরকে ভেঙে এখানে এই স্থানে মসজিদ তৈরি হয়েছে, তবে আমরা এটি ছেড়ে দেব। পরবর্তী বৈঠকে সাহাবুদ্দিন সাহেব নিজের বক্তব্য থেকে সরে যান। যখন চন্দ্রশেখর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখনো বার্তালাপ হয়েছিল। দু'পক্ষই নিজেদের তথ্যপ্রমাণ লিখিতভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দিয়েছিলেন। তথ্যপ্রমাণের আদান প্রদান হয়েছিল। তখন ঠিক হয়েছিল যে, দু'পক্ষের পণ্ডিতরা মুখোমুখি বসে উপস্থাপিত তথ্যপ্রমাণের উপর আলাপআলোচনা করবেন। ঠিক হলো ১৯৯১-এর ১০ জানুয়ারি দু'পক্ষের পণ্ডিতরা সামনাসামনি বসবেন। কিন্তু মুসলমান পক্ষের রাজস্ব ও আইন বিশেষজ্ঞরা মিটিঙে এলেন না। পুনরায় ওই মাসের ২৫ তারিখে গুজরাত ভবনে মিটিঙের আয়োজন করা হয়। মুসলমান পক্ষের কোনো বিশেষজ্ঞ সেখানেও আসেননি। তাঁদের অনুপস্থিতি অপমানজনক অনুভব করে বার্তালাপ পর্ব এখানেই সমাপ্ত হয়। অভিজ্ঞতা এরকম হয়েছিল যে, তাঁরা আলাপ আলোচনা থেকে পলায়ন করতে চাইছিলেন। প্রত্যেক প্রসঙ্গে অকারণ বাগড়া দিচ্ছিলেন। তখন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরা ভাবছিলেন আলাপ আলোচনা কোথা থেকে আরম্ভ করা যায়? অবশেষে দীর্ঘ ৪০ দিনের শুনানির পর গত ৯ নভেম্বর শীর্ষ আদালত শ্রীরাম জন্মভূমির পক্ষে রায় দিয়ে এই ঐতিহাসিক মামলার নিষ্পত্তি করেছেন। এবার কয়েক মাসের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে মন্দির নির্মাণের কাজ। আবার স্বমহিমায় রামজন্মভূমিতে মাথা তুলে দাঁড়াবে শ্রীরামলালার ভব্য মন্দির। ■

বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভের কাছে মানুষের অনেক প্রত্যাশা

কল্যাণ চৌবে

চিরকালই বিশ্বাস করে এসেছি খেলার জগতে প্রশাসক হিসাবে খেলোয়াড়দেরই প্রধান্য থাকা উচিত। কারণ একজন খেলোয়াড়ই অন্য খেলোয়াড়ের আক্ষরিক যন্ত্রণা বুঝতে পারে।

নভেম্বরে দিল্লির প্রবল বায়ু দূষণে যেখানে সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারে না, মুখে মাস্ক ব্যবহার করতে হয় সেখানে দিনরাত ব্যাপী ক্রিকেট খেলা যে কী যন্ত্রণাদায়ক কিংবা ভাদ্র মাসের প্রবল বর্ষায় কাদা মাঠে, কিংবা চৈত্র-বৈশাখের প্রখর রৌদ্রে কলকাতার ময়দানে ফুটবল খেলা কী কষ্টকর সেটা চার দেওয়ালের ঠাণ্ডা ঘরে বসে প্রশাসকের বোঝা সম্ভব নয় যদি না তিনি প্রাক্তন খেলোয়াড় হন।

তাই সৌরভ গাঙ্গুলি বোর্ড প্রেসিডেন্ট হওয়ায় যেমন খেলোয়াড়দের কাছে গর্বের, তেমনই খেলার মানেরও উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

এই মুহূর্তে প্রাক্তন খেলোয়াড়দের অনেক প্রত্যাশা বোর্ড সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলির কাছে। ক্রিকেট যেহেতু ভারতের জনপ্রিয়তম খেলা এবং ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড, বিশ্বের ধনীতম ক্রীড়া সংস্থা, সেহেতু ক্রিকেট বোর্ড এবং ক্রিকেটারদের নিয়ে একাধিকবার গড়াপেটা ও দুর্নীতির অভিযোগ এসেছে। সদ্য ভারত ও বাংলাদেশ ক্রিকেট সিরিজ আরম্ভের প্রাক্কালে বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক শাকিব আল হাসান দুই বছরের জন্য নির্বাসিত হয়েছেন।

অতীতে ভারতীয় ক্রিকেটের স্বচ্ছতা নিয়েও নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। তাই প্রাক্তন খেলোয়াড়রা এবং ভারতবর্ষের কোটি কোটি সৎ ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ যারা ভারতের জাতীয় দলের জয় পরাজয়ে ভীষণভাবে প্রভাবিত হন, সেই মানুষদের আবেগের কথা অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে বোর্ড প্রেসিডেন্ট হিসেবে। সুতরাং ক্রিকেটকে দুর্নীতিমুক্ত ও স্বচ্ছ হতে হবে। মনে রাখতে হবে, খেলার মান উন্নতির ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের যেমন ভূমিকা থাকে তেমনই খেলাকে জনপ্রিয় করতে দর্শকের ভূমিকাও অপরিসীম।

> “সৌরভ গাঙ্গুলি বোর্ড প্রেসিডেন্ট হওয়ায় যেমন খেলোয়াড়দের কাছে গর্বের, তেমনই খেলার মানেরও উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।”

যুব শক্তিকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য তৃণমূল স্তর থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের খুঁজে এনে ভালো প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এর জন্য অনেক অ্যাকাডেমি গঠন করতে হবে। সঠিক সুযোগ এবং প্রশিক্ষণের দ্বারা আজকের যুবশক্তি আগামীতে দেশের সম্পদ হবে।

ফুটবল যেমন ভারতবর্ষের প্রতিটা রাজ্যেই সমান জনপ্রিয় এবং জাতীয় দলে প্রত্যেকের যোগদান রয়েছে, ক্রিকেট কেবলমাত্র কয়েকটি রাজ্যেই সীমিত রয়েছে। তাই ক্রিকেটকে সর্ব ভারতীয় পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য পূর্ব ভারত এবং উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোর দিকে নজর দেওয়া আবশ্যক। শারীরিক সক্ষমতার জন্য উত্তর পূর্ব ভারতের পাহাড় অঞ্চল থেকে প্রচুর ফুটবলার উঠে আসে, তেমনই এই রাজ্যগুলো থেকে যদি সর্ব ভারতীয় পর্যায়ে ক্রিকেটারও উঠে আসে তাহলে তা আনন্দের হবে। সেই সঙ্গে বাঙ্গলার ক্রিকেট প্রেমীদের জন্য সুখবর, ২২ নভেম্বর থেকে ইডেনে ভারত ও বাংলাদেশ দিবারাত্রি ম্যাচে প্রথমবার গোলাপি বলে খেলা হচ্ছে। সেই খেলায় বিশ্বের অন্যতম নেতা তথা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত থেকেছেন। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রেমী বাঙ্গালির কাছে এটি অবশ্যই গৌরবের।■

ময়ূর

দু'হাজারেরও বেশি ভারতীয় পাখির মধ্যে অত্যন্ত চমৎকার, অত্যন্ত বিমোহিত করা উজ্জ্বল বর্ণময় পাখিদের অন্যতম হলো ময়ূর। ভারতের জাতীয় পাখি। এই চমৎকার জমকালো পাখি তার পালক নিয়ে রাজকীয় ভঙ্গিতে নাচতে থাকে। তখন আমাদের মনে আনন্দের ঢেউ উথলে ওঠে। ঋকবেদের শ্লোকে বলা হয়েছে— ইন্দ্রের প্রিয় পাখি ময়ূর। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মাথায় ময়ূরের পালক দিয়ে শোভা বাড়াতেন।

ময়ূরকুলের পাখিদের তিনটি প্রজাতিতে ভাগ করা হয়েছে। নীল ময়ূর বা ভারতীয় ময়ূর ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সবুজ ময়ূর ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ায় বসবাস করে। ইথিওপিয়ার দুই শিখা বা ঝুঁটিযুক্ত ময়ূর তৃতীয় প্রজাতির অন্যতম। ভারতীয় নীল ময়ূর পৃথিবী বিখ্যাত। এরা মোরগ গোষ্ঠীর পাখি। সংস্কৃতভাষায় এর বহু নাম— নীলকণ্ঠ, ভুজঙ্গভুক্, শিখি, কেকিন, মেঘানন্দা, শিখাদিন, চন্দ্রাকিন, কলাপিন, সীতাপাঙ্গ, শুক্লাপাঙ্গ, চিত্রাপিকো প্রভৃতি। হিন্দি, উর্দু, পঞ্জাবি, গুজরাঠি, মরাঠিতে 'মোর' বলা হয়। জীববিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় প্যাভো ক্রিস্টেটাস। স্ত্রী ময়ূরের পেখম থাকে না।

সব প্রজাতির ময়ূর পোষ মানে। এরা সর্বভুক । উদ্ভিদ জাতীয় খাদ্য অর্থাৎ নিরামিষ আবার পোকামাকড়, কীট-পতঙ্গ, এমনকী ছোটো-বড়ো সাপও অনায়াসে খেয়ে ফেলে। চাষিরা এদের পছন্দ করে না। কারণ এরা ফসলের ফল-ফুল খেয়ে অনেক ক্ষতি করে। রাত্রিবেলা এরা গাছের ডালে বিশ্রাম করে। ময়ূর কার্তিক ঠাকুরের বাহন। মোরগ জাতীয় পাখি হওয়ার জন্য এদেরও চারিটি গুণ বিদ্যমান —যুদ্ধের জন্য সদা প্রস্তুত। প্রাতরুত্থান, পরিবার পরিজন সহ ভোজন এবং বিপন্না স্ত্রী রক্ষায় সচেষ্ট।

ময়ূরের ডাককে কেকাধ্বনি বলে। ডাক বেশ দীর্ঘ ও কর্কশ। জঙ্গলে কোনো হিংস্র প্রাণী, বিশেষ করে বাঘের দেখা পেলেই উঁচু স্বরে ডাকতে থাকে। এতে অন্যান্ন পশুপাখি সতর্ক হয়ে যায়। স্ত্রীময়ূর নদীনালার ধারে ঘন ঘাসবনে কাঠকুটা পাতা দিয়ে বাসা তৈরি করে। একবারে চার থেকে ছটি ডিম দেয়। ডিম ফুটতে মাসখানেক সময় লাগে। এক মাসের মধ্যে ছানা উড়তে শেখে। ময়ূর তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছর বাঁচে। পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের একটি চূড়ার নাম ময়ূর পাহাড়। এখানে এক সময় প্রচুর ময়ূরের দেখা মিলত। পালক ও মাংসের লোভে মানুষ এদের শেষ করে ফেলেছে। এখন শুধু নামটুকুই আছে।

শিল্প, সাহিত্য ও ভাস্কর্যে ময়ূরের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। ময়ূরের সৌন্দর্য বিশ্বনন্দিত। ২৫০০ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টপূর্ব সময়ের সিন্ধুসভ্যতার যুগ থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাপ্ত শিলালিপি ও চিত্রশৈলীতে ময়ূরের উজ্জ্বল উপস্থিতি পাওয়া গেছে। হরপ্পাতে মিলেছে পোড়ামাটির পাত্র আর তাতে পাওয়া গেছে ময়ূরের চিত্র। গোয়ালিয়রে পাওয়া প্রস্তরস্তম্ভে ময়ূরের চিত্র রয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর সাঁচীস্তূপে পাওয়া গেছে জোড়া ময়ূরের চিত্র। বর্ধমানে পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকে মাটির পাত্রের ভাঙা টুকরোয় পাওয়া গেছে মুখে সাপ নিয়ে উড়ন্ত ময়ূরের ছবি।

আমাদের রাজ্যে হুগলী জেলার রাজহাট গ্রামে ময়ূরের দেখা মেলে। সাদামাটা গ্রাম কিন্তু ময়ূরের দৌলতেই বিখ্যাত হয়ে আছে। স্থানীয় মানুষের মতে অন্তত দুশো বছর ধরে এখানে ময়ূর বসবাস করছে। গ্রামের মানুষ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে এদের দেখাশোনা করছেন। শৈবরা ময়ূরকে খুবই পবিত্র পাখি বলে মনে করে। কারণ মহাদেবের গায়ের রং নীল। বৌদ্ধদর্শনে ময়ূরকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রতীক বিবেচনা করা হয়। গ্রিক পুরাণে 'জুনো-আগুস'-এর উপকথায় ময়ূরের প্রসঙ্গ আছে। ১৯৬৩ সাল থেকে ময়ূর ভারতের জাতীয় পাখি। মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভবে শিব-পার্বতীর বিবাহে ময়ূরের নৃত্যের বর্ণনা আছে। মেঘদূত ও ঋতুসংহারে কালিদাস লিখেছেন— ময়ূর হলো জীবনের আনন্দের মহান প্রতীক।

—তাপস অধিকারী

ভারতের পথে পথে

হরিদ্বার

শিবালিক পাহাড়ের পাদদেশে উত্তরাখণ্ড রাজ্যের সাহারানপুর জেলায় ২৯২.৭ মিটার উঁচুতে হরিদ্বার। পুরাণের মায়াপুরী আজকের হরিদ্বার পবিত্র তীর্থস্থান। সপ্তপুরীর অন্যতম এই হরিদ্বার। মা গঙ্গাই হরিদ্বারের মূল আকর্ষণ। এখানে হিমালয় থেকে গঙ্গা নেমেছে হরি কি পৌরি ঘাটে। এখানে রয়েছে গঙ্গামাতার মন্দির। রয়েছে ভগবান বিষ্ণুর চরণচিহ্ন। বারো বছর অন্তর পূর্ণকুম্ভ মেলা বসে। ছ'বছর অন্তর বসে অর্ধকুম্ভ মেলা। বিল্বপর্বতের চূড়ায় রয়েছে মনসাদেবীর মন্দির ও চণ্ডীমন্দির। প্রত্যহ সন্ধ্যায় হরি কি পৌড়ির ঘাটে হয় গঙ্গারতি। ৬ জন পুরোহিত একসঙ্গে ১০০৮ প্রদীপের গঙ্গারতি করেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। ৫ কিলোমিটার দক্ষিণে রয়েছে কনখলে রয়েছে দুর্গামন্দির, দক্ষ প্রজাপতি মন্দির, সতীকুণ্ড, শ্রীজগদ্‌গুরু আশ্রম। ৫ কিলোমিটার উত্তরে আছে ভারতমাতা মন্দির, সপ্তঋষি আশ্রম।

জানো কি?

- মৃত্যুকালে মানুষের প্রথম দৃষ্টিশক্তি চলে যায়, তারপর স্পর্শ, তারপর শ্রবণশক্তি।
- মৃত্যুর পর মানুষের মস্তিষ্ক প্রায় ৭ মিনিট সক্রিয় থাকে।
- একটা সিগারেট খাওয়ার অর্থ ১১ মিনিট আয়ু কমে যাওয়া।
- মানুষের চোখ প্রতি সেকেন্ডে ৪০টি স্থির চিত্র মস্তিষ্কে প্রেরণ করে।
- নতুন কলম হাতে নিলে মানুষ প্রথমে নিজের নাম লিখে থাকে।
- নতুন কোনো অভ্যাস তৈরি হতে মানুষের ২১ দিন সময় লাগে।

ভালো কথা

আদর্শবান যুবক

আমার দাদার কাছে শোনা। তার বন্ধু রাজস্থানের জয়পুরের জিতেন্দ্র সিংহ। বিএসএফ-এ চাকরি করেন। ছত্তিশগড়ে পোস্টিং। জয়পুরের কনে চঞ্চল শেখাওয়াতের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়েছে। শহরের অম্বাবাড়িতে বিয়ের আসর বসেছে। যথাসময়ে বরযাত্রী, আত্মীয়স্বজন-সহ জিতেন্দ্র হাজির। একটু পরেই শুরু হলো বিয়ের অনুষ্ঠান। কনের বাবা বরকর্তার হতে বরপণের ১১ লক্ষ টাকা দিতে এলেন। জিতেন্দ্র এগিয়ে এসে মেয়ের বাবাকে বললেন তার কোনো টাকা চাই না। চাই না সোনাদানা, পালংক বা কোনো উপহার। মেয়ে পক্ষের লোকেরা ভয় পেয়ে গেলেন। তারা ভাবলেন পাত্রের বুঝি আরও টাকা চাই। জিতেন্দ্র বললেন তিনি পণপ্রথার বিরোধী। কনের বাবার সম্মান রাখতে তিনি মাত্র ১১ টাকা ও একটি নারকেল গ্রহণ করে বিয়ে করলেন। বিয়েবাড়ির সবাইকে শুনিয়ে তিনি বললেন পণ না নিয়ে বিয়ে করার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আজ সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হলো। বিয়েবাড়ির সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল।

শ্রেয়া চৌধুরী, দ্বাদশ শ্রেণী, বিরামপুর, ইংরেজ বাজার, মালদা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

সুখ দুঃখ

সপ্তরাজ গোলদার, পঞ্চম শ্রেণী, নবাবনগর, পূর্ব বর্ধমান।

ঠাকুরবাড়ি ঠেলাঠেলি
লোকের নাই শেষ
অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায়
ভেসে যায় যে দেশ।
আজকের দিনে সুখ যত
নাই যে দুঃখ এর মতো।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ১৩।।

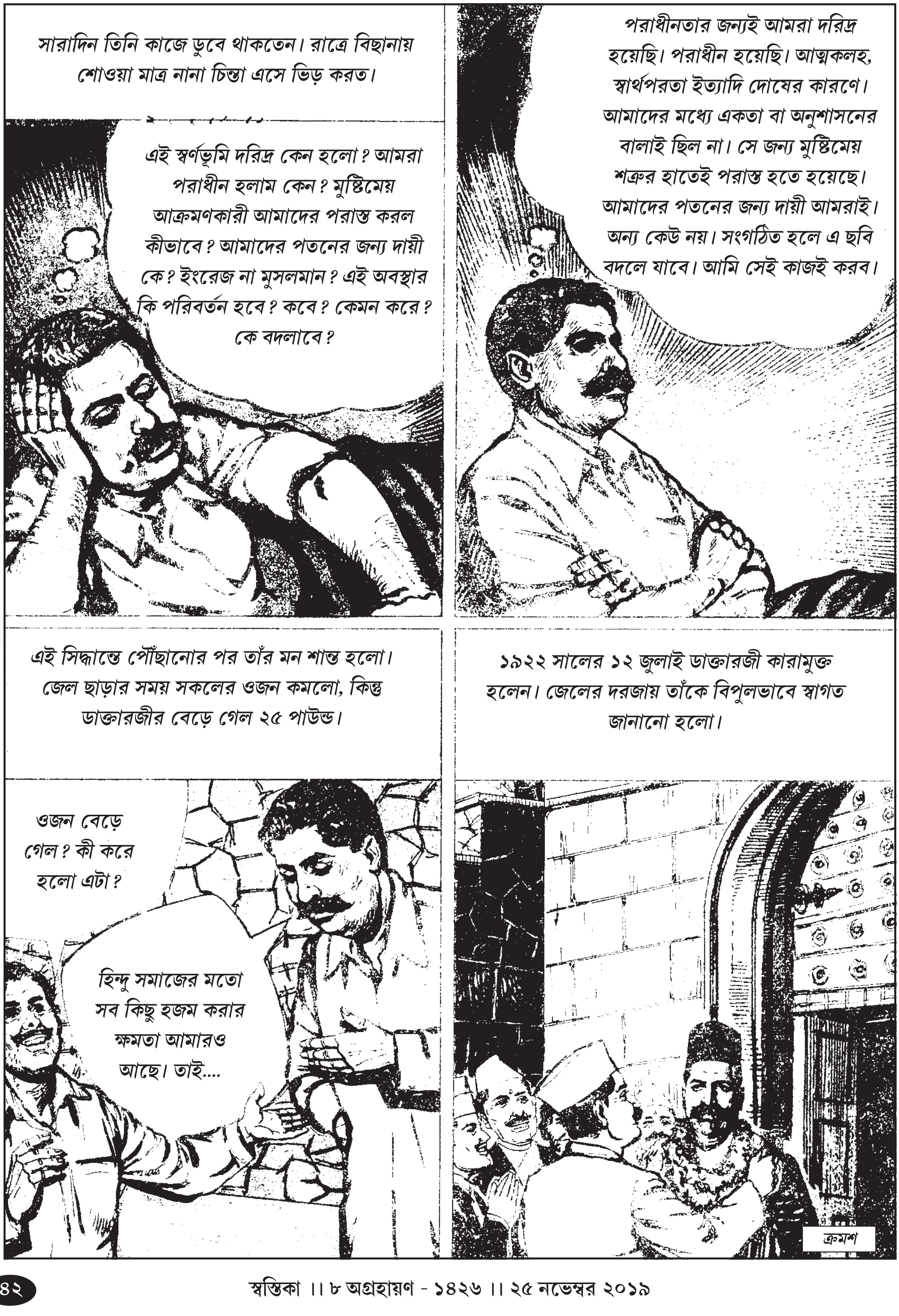

অযোধ্যার রামমন্দির ও ইতিহাস নতুন করে ফিরে দেখা

বিমল শঙ্কর নন্দ

অযোধ্যা নিয়ে ভবিষ্যতের ইতিহাস লেখকরা অনেকগুলি বিষয় সম্পর্কে অবাক হতে পারেন। একটি ধর্মস্থান পুনরুদ্ধারের আন্দোলন কীভাবে এতোটা আবেগ তৈরি করতে পারে সেটা অবাক করার মতোই বিষয়। ধর্মভীরু মানুষদের দেশ ভারতে ধর্মস্থানের অভাব নেই। কিন্তু একটি ধর্মস্থান যা প্রায় ৫০০ বছর আগে হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল, পাঁচ শতাব্দীর নিরন্তর চেষ্টায় তা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হলো। একটি ধর্মস্থান পুনরুদ্ধারের জন্য পাঁচ শতাব্দী জুড়ে আন্দোলনের ইতিহাস গোটা পৃথিবীতেই পাওয়া কঠিন। এই আন্দোলন কেবল ধর্মীয় আন্দোলনের সীমা ছাড়িয়ে ক্রমেই একটি জাতীয় পরিচিতি রক্ষার আন্দোলনে পরিণত হয়েছে সেটাও অযোধ্যার রামজন্মভূমি পুনরুদ্ধার আন্দোলনের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভারতবর্ষ বার বার বহিরাগত লুঠেরাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। নিজেদের শক্তিশালী সামরিক পক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার ব্যর্থতা এবং অনৈক্য এই দেশকে দুর্বল করে রেখেছিল। ফলে এদেশের মানুষ তার সম্পদ, সম্মান এবং ঐতিহ্য হারিয়েছে। এটা ঠিক, ঘড়ির কাঁটাকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কিছু কিছু বিষয় যা একান্তভাবেই মানুষের মনের মণিকোঠায় থাকে সময়ের গতি তাকে ভুলিয়ে দিতে পারে না। হিন্দুদের একটা বড়ো অংশ বিশ্বাস করেন অযোধ্যা রামের জন্মভূমি। সেই জন্মভূমি হাতছাড়া হয়েছিল বিজয়ী শক্তির ধ্বংসলীলায়। সেই জন্মস্থানের পুনরুদ্ধার কোটি কোটি মানুষের কাছে নিজের গরিমা এবং ঐতিহ্য ফিরে পাওয়া। সেই দিকে দিয়ে দেখলে অযোধ্যার রামজন্মভূমি পুনরুদ্ধারের আন্দোলন আসলে জাতীয় গরিমা ও ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন।

বি. বি. লাল এবং কে. কে. মহম্মদ।

অযোধ্যায় রামের জন্মস্থান ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পাঁচ শতাব্দীর। ১৫২৮ সালে মুঘল সম্রাট বাবরের নির্দেশে মির বাকি গড়ে তোলেন এই মসজিদ। ইসলামি এবং বাম-উদারপন্থী বুদ্ধিজীবীদের মতে মন্দির ভেঙেই মসজিদ তৈরি হয়েছিল তার প্রমাণ নেই। অথচ ২০০৩ সালে ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বা এ. এস. আই. বিতর্কিত কাঠামোর নীচে খননকার্য চালিয়ে যে রিপোর্ট পেশ করেছিল তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছিল যে ভূগর্ভের কাঠামোটি ইসলামি নয়। কাঠামোটি মন্দির কিনা সেটা নিয়ে এ.এস.আই. কিছু বলেনি। কিন্তু খননকার্যের ফলে যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তা একাদশ দ্বাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে তৈরি। ১৮৬২-৬৩ সালে অযোধ্যায় প্রথম খননকার্য চালান আলেকজান্ডার কানিংহাম। দ্বিতীয় খননকার্য চলে ১৮৮৯-৯১ সময় কালে যার দায়িত্বে ছিলেন এ-ফুহরার। ১৯৬৯-৭০ সালে তৃতীয় দফার খননকার্য চলে এ.কে. নারায়ণের নেতৃত্বে। চতুর্থ দফার খননকার্য চালানো হয়েছিল ১৯৭৬-৭৭ সালে যার নেতৃত্বে ছিলেন ব্রজবাসী লাল। কানিংহাম রামের

দেওয়াল চিত্র

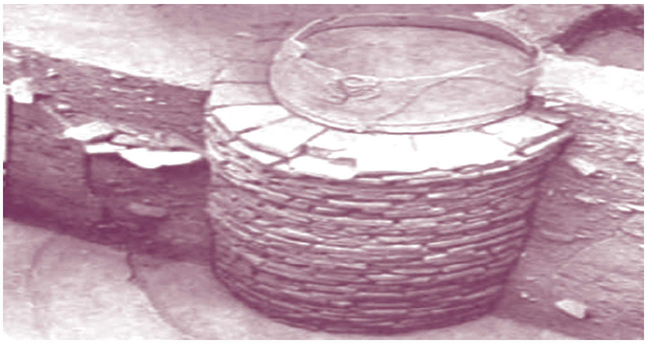

ভগ্নবেদী

ঐতিহ্যে সঙ্গে অযোধ্যার যোগসূত্র স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তিনি মেনে নিয়েছিলেন সে ওই অযোধ্যাই রামায়ণের যুগের অযোধ্যা।

ফুহরারও তার রিপোর্টে একই মত পোষণ করেন। ব্রজবাসী লাল তার রিপোর্টে জানিয়েছিলেন যে বাবরি মসজিদের লাগোয়া ১২টি পাথরের স্তম্ভে হিন্দুদের নির্মাণশৈলী ও চিহ্ন আছে। এখান থেকে তিনি মত প্রকাশ করেন যে স্তম্ভগুলি মসজিদের অংশ নয়। লাল স্পষ্ট করেই বলেছেন যে তাঁর ধারণা অনুযায়ী বিতর্কিত অংশটি হিন্দু মন্দির। তার উপরেই তৈরি হয়েছে মসজিদ। অযোধ্যায় পরবর্তী খননকার্য চলে ২০০৩ সালে। ১৯৭৬-৭৭ এবং ২০০৩ সালে অযোধ্যায় যে খননকার্য হয়েছিল সেই দলের সদস্য ছিলেন পুরাতাত্ত্বিক কে. কে. মহম্মদ। মহম্মদ ১৯৭৬-৭৭ সালে ব্রজবাসী লালের নেতৃত্বে যে খননকার্য হয়েছিল তাতে শিক্ষানবীশ হিসাবে অংশ নেন।

২০০৩ সালের খননকার্যে তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর মতে ১৯৭৬-৭৭ সালে তাঁরা মসজিদে ১২টি স্তম্ভ দেখেছিলেন যা ভেঙে যাওয়া মন্দিরের অংশ দিয়ে তৈরি। তাঁর ভাষায় "স্তম্ভের গোড়ার দিকে হিন্দুদের পবিত্র অষ্টমঙ্গল চিহ্নের অন্যতম পূর্ণ কলসের অস্তিত্ব ছিল যা প্রমাণ করে ওই স্থানে আগে থেকেই মন্দির ছিল।" এছাড়া ২০০৩ সালে বিতর্কিত স্থানে দুটুকরো হয়ে যাওয়া শিলা ফলক পেয়েছিলেন সেখানে উল্লেখ ছিল এই মন্দির বিষ্ণুর সেই অবতারকে উৎসর্গ করে তৈরি, যিনি পৌরাণিক চরিত্র কিষ্কিন্ধারাজ বালি এবং দশ মাথা বিশিষ্ট দৈত্যকে মেরেছিলেন।

সেই মন্দিরের ১৭টি স্তরে থাকা একই রকমের ৫০টি স্তম্ভের অস্তিত্ব ২০০৩ সালে পাওয়া যায়। স্বাভাবতই একে হিন্দু শাস্ত্র মতে 'রাম'-এর মন্দির হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। (তথ্যসূত্র : এই সময়, কলকাতা, ১০ নভেম্বর ২০১৬)। অযোধ্যা মামলার রায় বেরোনোর পর কলকাতার দৈনিক পত্রিকা 'এই সময়'কে মহম্মদ বলেছিলেন আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরিতে (তৃতীয় খণ্ডে) অযোধ্যায় এই অংশে হিন্দুদের উপাসনাস্থল থাকার কথা বলা হয়েছে। এর উল্লেখ আছে পরবর্তীকালে জাহাঙ্গীর-শাহজাহান-এর

টেরাকোটা মূর্তি

আমলে ১৬১১ সালে ভারতে আসা ঐতিহাসিক উইলিয়াম ফিঞ্চের লেখায় বা পরবর্তীকালে ডাচ ঐতিহাসিক জন ডিলান এবং ক্যাথলিক ধর্মযাজক জোসেফ টেলরের লেখায়। মহম্মদ আরো বলেছিলেন যে খননকার্য চালানোর সময় ২৬৩টি টেরাকোটা নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায় যাতে নরনারী এবং একাধিক দেবদেবীর ভাস্কর্য ছিল। ওই অংশে চিরকাল মসজিদ থাকলে সেখানে নরনারী বা দেবদেবীর ভাস্কর্য থাকা সম্ভব নয়, কারণ মসজিদে এমন কখনোই থাকতে পারে না।

এছাড়াও বিগ্রহকে অভিষেকের সময় স্নান করানোর জন্য কুমীরমুখী নালারও সন্ধান পাওয়া গেছে যা হিন্দুদের এক ধর্মীয় রীতি। সুতরাং পুরাতত্ত্ববিদ যাঁরা মূলত আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অতীতকালের নিদর্শনগুলিকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন তাঁরা কোথাও বলেননি বাবরি মসজিদ কোনো অ-ইসলামি কাঠামো ভেঙে তৈরি হয়নি। তা পুরোপুরি ফাঁকা জমিতে তৈরি হয়েছিল। বরং ভারতে বিদেশি আক্রমণের সময় এবং কয়েক শতকের ইসলামি শাসনে মন্দির ভাঙার ঘটনা কম ঘটেনি। অযোধ্যা এবং আরো অজস্র ছোটো বড়ো মন্দিরের পাশাপাশি গুজরাটের সোমনাথ, কাশীর বিশ্বনাথ এবং মথুরার কৃষ্ণ মন্দির ধ্বংসের কথা ইতিহাসের পাতাতেই উল্লেখ আছে। সুতরাং অযোধ্যার বিতর্কিত কাঠামোর নীচে কোনো হিন্দু মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল না বাম ঐতিহাসিকদের এই দাবি কেবল ভিত্তিহীন নয়, তা বাস্তবমুখী ইতিহাসচর্চার বিরোধী। ঐতিহাসিক অনুসন্ধান হয় সত্যকে জানার জন্য। তাকে বিকৃত করা বা মনগড়া তত্ত্ব দিয়ে নিজের ইচ্ছামতো ব্যাখ্যা করার জন্য নয়। আসলে বাম-উদারবাদী ঐতিহাসিকরা মনে করেন ভারতের অতীত ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নেই। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা মনে করেন ভারতের ইতিহাস তার অতীত ঐতিহ্য প্রমাণ করে যে ভারত পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন জাতি এবং এর ঐতিহ্য ও প্রাচীনত্বই ভারতের জাতীয়তাবাদের অন্যতম ভিত্তি হতে পারে। বাম-উদারবাদী ইতিহাস লেখকরা ভারতের একীকরণে ইসলামি শাসন, আধুনিকীকরণে ব্রিটিশ শাসনকে যতটা গুরুত্ব দিয়েছেন, হিন্দু সম্রাট ও তাঁদের অবদানকে স্বীকার করতে তাঁদের ততটাই বাধা। তারা তো ভারতকে জাতি মানতেই চান না।

ইতিহাসের আর একটি উপদান হলো মৌখিক ইতিহাস বা ওরাল হিস্ট্রি। ঐতিহাসিকরা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা, মানুষের মুখে মুখে ফেরা কাহিনি থেকে ইতিহাসের অনুসন্ধান করেন। তারা কেউই পৌরাণিক গ্রন্থকে নিতান্তই গল্পকথা বলে উড়িয়ে দেন না। বরং তার মধ্যেই খোঁজেন ইতিহাসের উপাদান। রামায়ণকে নিয়ে ভারত ও তাঁর পার্শ্ববর্তী দেশ এবং অঞ্চলগুলিতে বহু ভাবনা, বহু ইতিহাস আছে। সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইন্দোনেশিয়া, তাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া কিংবা বার্মায় (মায়ানমার) রামায়ণ নানা রূপে উপস্থিত। ভারতে লোককথা, উপকথা কিংবা ইতিহাস চর্চায়ও রাম নানাভাবে উপস্থিত। কেবল একটি কাল্পনিক চরিত্রের পক্ষে ইতিহাসের এতোটা অংশ জুড়ে স্থান পাওয়া অসম্ভব। তাই যাঁরা রামকে নিছক কাল্পনিক চরিত্র বলে গুরুত্বহীন করার চেষ্টা করেন তারাই ইতিহাসকে বিকৃত করেন নিজের স্বার্থে। মানুষের কাছে তাঁদের ভাবনার গ্রহণযোগ্যতা নেই।

এই একবিংশ শতকে সেই রাম কিন্তু গোটা দেশকে একসূত্রে বেঁধেছেন, ফিরিয়ে এনেছেন একটি জাতির হারিয়ে যাওয়া গরিমা, অসম্মান ভুলে সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে বাঁচার বাসনাকে। এই আধুনিক যুগে রাম আছেন। থাকবেনও ঐক্য ও শৌর্যের প্রতীক হয়ে। ▌

রামমন্দিরের সংগ্রাম : ৫০০ বছরের ইতিহাস

অভিমুন্য গুহ

রামমন্দির মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় ইতি টানল পাঁচশো বছরের সংগ্রামের। সেই সঙ্গে ১২৫ বছরের আইনি লড়াইয়েরও। পৃথিবীর ইতিহাসে এত দীর্ঘদিন কোনও সংগ্রাম চলেছে কিনা, আমার জানা নেই। তবু একটি সুবিচারের জন্য প্রজন্মের পর প্রজন্মের অপেক্ষা, হিন্দুদের ধৈর্য্যশক্তি বিশ্বের কাছে শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে। ইতিহাস বলছে ১৫২৮ সালে বাবরের এক সেনাপ্রধান মির বাকি অযোধ্যায় রাম-মন্দির ধ্বংস করে তার ওপরে বাবরের নামাঙ্কিত এক মসজিদ-কাঠামো গড়ে তোলে। প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল আমলে পুরোদস্তুর কোণঠাসা, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে বিবেচিত, নিপীড়িত, পদদলিত হিন্দুদের সেই সাহস ছিল না যে, বাবরি ধাঁচা নির্মাণের প্রতিবাদ করবে। ব্রিটিশদের আগমনের পর মোগলদের প্রতিপত্তি হ্রাস পেতেই হিন্দু সমাজে আস্তে আস্তে এনিয়ে সাহসের সঞ্চার হচ্ছিল। ১৮৫৬-৫৭ সাল নাগাদ মহাবিদ্রোহের আগে পরে কোনো এক সময় ব্রিটিশরা লোহার রেলিং দিয়ে এলাকাটিকে দুটি ভাগে ভাগ করে দেয়। ঠিক হয়, মসজিদের চত্বরের ভেতরের দিকে মুসলমানরা বাইরের দিকে হিন্দুরা তাদের পুজোপাঠ করবেন। ১৮৭৭ সালে উত্তর দিকের আরেকটা দরজা খুলে দেওয়া হয় হিন্দুদের জন্য। যাতে রামচবুতরা ও কৌশল্যা (সীতা) রসুইয়ে তারা পুজোপাঠ করতে পারেন।

এর আট বছর বাদে প্রথম আইনি লড়াইয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়। রাম চবুতরায় মন্দির নির্মাণের জন্য মোহন্ত রঘুবর দাস ১৮৮৫ সালের ২৯ জানুয়ারি ফৈজাবাদ আদালতের দারস্থ হন। যদিও ২৪ ডিসেম্বর ফৈজাবাদের সাবজজ রামচবুতরায় মন্দির নির্মাণের দাবিকে অস্বীকার করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল রাম-চবুতরায় মন্দির নির্মাণের চেষ্টা হলে হিন্দু- মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যাবে। এবার শুরু হলো আইনি সংগ্রামের, এর আগে ৩৬৭ বছর হিন্দুরা তাঁদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, এবার আইনি লড়াই চলল ১২৫ বছর ধরে। হারতে হারতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যেতে যেতে অদম্য মনোভাব নিয়ে তাঁরা তাঁদের ন্যায্য অধিকারের আইনি স্বীকৃতি পেলেন ২০১৯-এ এসে।

ফৈজাবাদের সাবজজের বিচারে পরাজিত হলেও দমে যাননি রঘুবর। তিনি এই বিচারের প্রতিবাদে ফৈজবাদ জেলা জজের এজলাসে ওই রায়ের বিপক্ষে আবেদন জানান। ফৈজাবাদ জেলা জজ এফ ই এ চামিয়ার অদ্ভুত এক সিদ্ধান্ত নেন। তিনি স্বীকার করে নেন ৩৫৬ বছর আগে যে ঘটনা ঘটেছে তা হিন্দুদের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক অর্থাৎ হিন্দুরা যে ভূমিকে পবিত্র বলে মনে করে, সেখানেই মুসলমানরা গড়ে তোলে মসজিদ। তবে চামিয়ার সঙ্গে সঙ্গে এও জানিয়ে দেন এখন আর কোনো উপায় নেই, এই পরিস্থিতিই রক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ এখানেও সম্প্রীতি রক্ষার যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হলো হিন্দুদের মর্যাদাপুরুষোত্তমকে।

এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করলেও অযোধ্যার বিচার বিভাগীয়

কমিশনার বিচারপতি ডব্লিউ ইয়ং তা অগ্রাহ্য করেন। ১৯৩৪ সালে অযোধ্যায় হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয় মসজিদের একটি গম্বুজ। হিন্দুদের দমিয়ে রাখতে ইংরেজরা তখন মুসলমানদের যাবতীয় ব্যাপারে মদত জোগাচ্ছে। অযোধ্যাতেও এর ব্যতিক্রম হলো না। ব্রিটিশরা হিন্দুদের জরিমানাই যে শুধু করলো তা নয়, মসজিদের গম্বুজও সারিয়ে দিল। ভারতের স্বাধীনতার পর ১৯৪৯ সালের ২৯ ডিসেম্বর ফৈজাবাদের অতিরিক্ত নগর দায়রা বিচারক মার্কন্ডেয় সিংহ মসজিদের সম্পত্তিকে বিতর্কিত বলে রায় দেন এবং স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান পিয়া দত্ত রামকে পুরো সম্পত্তির রিসিভার হিসাবে নিযুক্ত করেন। কারণ সেই মুহূর্তে হিন্দুদের দাবিকে অগ্রাহ্য করার উপায় ছিল না। কেন্দ্রীয় গম্বুজের নীচে রামলালার মূর্তি স্থাপিত হয় ২২-২৩ ডিসেম্বরে, রায় ঘোষণার কিছুদিন আগেই। যার ফলে মসজিদে নামাজ পাঠ বন্ধ করে দেয় মুসলমানরা, কারণ রামলালার মূর্তির স্থাপনে তাদের 'ধর্মে' ব্যাঘাত ঘটে।

১৯৫০ সালের ১৬ জানুয়ারি গোপাল সিংহ ডিসাবাদ বলে এক ভক্ত আদালতে রামলালার সুরক্ষার জন্য আবেদন করেন এবং কেন্দ্রীয় গম্বুজ থেকে যাতে রামলালাকে কোনওমতেই অপসারিত না করা হয় এই মর্মেও আবেদন জানান। ওই বছরের শেষে ৫ ডিসেম্বর গোপাল সিংহ নামে আরেক ব্যক্তিও অনুরূপ মর্মে আদালতে আর্জি জানান। যদিও এই আর্জি খারিজ হয়ে যায় আদালতে, কারণ ১৯৯০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর এলাহাবাদ হাইকোর্ট থেকে এই মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

১৯৫৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর নির্মোহী আখড়া আদালতে আবেদন জানায় রাম জন্মভূমি এলাকার সেবায়েতের ভার তাদের হাতে দেওয়া হোক। ১৯৬১ সালে আসরে নামে সুন্নী ওয়াকফ বোর্ড। ১৮ ডিসেম্বর আদালতে আবেদন জানানো হয় যে বাবরি মসজিদ মুসলমানদের সম্পত্তি এবং ১৫২৮ সাল থেকে সেখানে নামাজ পড়ছে মুসলমানরা। ১৯৯৫ সালের ২৫ মে আরএকটি আবেদন সেখানে জুড়ে দিয়ে বলা হয়, অস্থায়ী কাঠামো ভেঙে দিয়ে হিন্দুদের পুজোপাঠ বন্ধ করে পুরো এলাকা তাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক। ১৯৬৪ সালের ৬ জানুয়ারি উপরোক্ত চারটে আবেদন একত্রিত করে শুনানির ব্যবস্থা করে ফৈজাবাদ নগর দায়রা আদালত। ১৯৮৬ সালের ২৫ জানুয়ারি অ্যাডভোকেট উমেশচন্দ্র পাণ্ডে আদালতে আর্জি জানান তালা ভেঙে সবাইকে পুজো পাঠের সুবিধা ও বন্দোবস্ত দিতে হবে। এতদিন পর্যন্ত জনসাধারণের এই সুযোগ ছিল না। কয়েকজন পুরোহিত কেবল এই সুযোগ পেতেন।

১ ফেব্রুয়ারি ফৈজাবাদের জেলা জজ তালা খোলবার আদেশ দেওয়া মাত্র, কয়েক মিনিটের মধ্যে তালা খুলে দেওয়া হয়। সারা দেশের মানুষ রামমন্দির আন্দোলন সম্বন্ধে অবহিত হতে শুরু করলেন। দেবকী নন্দন আগরওয়াল ১৯৮৯ সালের পয়লা জুলাই ঐতিহাসিক তথ্য হাজির করে প্রমাণ করলেন বিক্রমাদিত্যের আমল থেকে অযোধ্যায় রাম মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল এবং সেই রামমন্দির ভেঙে বাবরের অনুগামীরা তার নামে মসজিদ তৈরি করেছে। ১৯৮৯ সালের ১০ জুলাই ফৈজাবাদ জেলা আদালত থেকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে মামলা স্থানান্তরিত হয়।

এই বছরই 'পালামপুর রেজোলিউশনে' বিজেপি রামমন্দির ইস্যুকে তাদের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডার মধ্যে নিয়ে আসে এবং এর পরের বছর এল কে আদবানির রথযাত্রায় গোটা দেশে ব্যাপক সাড়া পড়ে। বিহার থেকে তিনি গ্রেপ্তার হন। সেই মুহূর্তে হিন্দুদের এই দাবিকে স্বীকার করতে কোনও রাজনৈতিক দলই প্রস্তুত ছিল না। আজ ৩০ বছর বাদে কমিউনিস্ট গোষ্ঠী আর কিছু সেকুলার নামধারী পাক-পন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী বাদে সকলেই রামমন্দিরের পক্ষে তাদের অভিমত দিয়েছেন। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর এই বিতর্কিত ধাঁচা গুঁড়িয়ে দেন করসেবকরা।

কোর্টের আদেশে ২০০৩ সালে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া তাদের খনন প্রক্রিয়া চালায়। ২০১০ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট রায় দেয় ২.৭৭ একর জমি তিন ভাগে ভাগ করা হবে। রামলালার মন্দির গড়ার জন্য তার পক্ষে হিন্দু মহাসভা এক তৃতীয়াংশ, সুন্নী ওয়াকফ বোর্ড এক তৃতীয়াংশ, আর বাকি এক তৃতীয়াংশ নির্মোহী আখড়া পাবে। অবশেষে ২০১৯ সালে আগস্ট-অক্টোবরে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চে মামলার চূড়ান্ত শুনানি হয় এবং গত ৯ নভেম্বর দীর্ঘ পাঁচশো বছরের অবিচারের পর সুবিচার পান ভারতবর্ষের নাগরিকবৃন্দ। ■

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদা জেলার গাজোল শাখার স্বয়ংসেবক, স্বস্তিকা পত্রিকার জেলা প্রচার প্রতিনিধি ও সরস্বতী শিশুমন্দিরের আচার্য পরেশ চন্দ্র সরকারের পিতৃদেব বিষ্ট সরকার গত ১২ নভেম্বর গাজোলের কদুবাড়িতে নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ৩ পুত্রবধূ, ১ কন্যা ও জামাতা, ৬ নাতি, ৪ নাতনি এবং বহু গুণমুগ্ধ আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব রেখে গেছেন।

* * *

হাওড়া জেলার বাগনানের প্রবীণ স্বয়ংসেবক অমল কুমার বসু গত ১১ নভেম্বর নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি একমাত্র পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতনিকে রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, ১৯৮৯ সালে তিনি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন। তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা প্রাপ্ত ছিলেন। মহকুমা কার্যবাহ, জেলা বৌদ্ধিক প্রমুখ, প্রান্ত বৌদ্ধিক টোলির সদস্য হিসেবে যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রজ্ঞা প্রবাহ, সংস্কার ভারতী, সহকার ভারতী ইত্যাদি সংগঠনেও দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি সুবক্তা ও লেখক ছিলেন। তাঁর পুত্র সপ্তর্ষি প্রথম বর্ষ শিক্ষিত স্বয়ংসেবক।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগরের নেতাজীনগর শাখার স্বয়ংসেবক অরুণ রায় চৌধুরী গত ২৭ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তিনি মা, সহধর্মিণী, ১ ভাই ১ বোন ও ২ পুত্র রেখে গেছেন।

আজকের রামমন্দির আগামী দিনের রামরাজ্য

শচীন্দ্রনাথ সিংহ

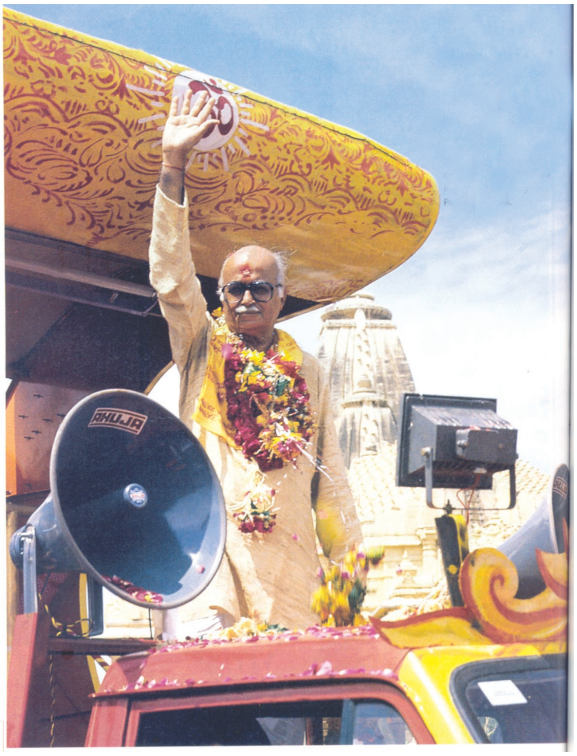

কোনো দেশ তখনই মহান হয় যখন সেই দেশে বসবাসকারী সমস্ত নাগরিক তাঁর নিজ দেশের আস্থা, বিশ্বাস ও পরম্পরার প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়। কেবল জনতার ভিড় রাষ্ট্রীয় অস্মিতাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে বিশ্বের অনেক দেশ কেবল ভৌগোলিক দৃষ্টিতে বিদ্যমান থাকলেও আজ তার অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ইকবাল বলেছেন ‘‘য়ুনান, মিশ্র, রোম সব মিট গয়ে জাঁহাসে, কুছ বাত হ্যায় হস্তি মিটতি নেহি হমারী’’ এই সব দেশগুলি সমাপ্ত হয়ে গেছে কারণ তাঁদের নিজ সংস্কৃতি বিনষ্ট করে ফেলেছে তাই, কিন্তু শত আঘাতেও মরেনি এদেশ। কারণ কী ? ভারত রাজনৈতিক দিক থেকে পরাধীন হলেও সাংস্কৃতিক পরাজয় তার কখনও হয়নি। নিজ বৈশিষ্ট্য, শ্রদ্ধাকেন্দ্র, সংস্কৃতি রক্ষার জন্য ভারতবর্ষ হাজার হাজার বছর ধরে নিরন্তর সংঘর্ষ করে এসেছে। ব্যক্তিগত জীবন তুচ্ছ, রাষ্ট্র সর্বোপরি— এই মানসিকতা নিয়ে বংশানুক্রমে বলিদানের পরম্পরা তৈরি করেছে। আসুরী শক্তিকে ভারতভূমিতে কখনও স্থায়ীভাবে খুঁটি গাড়তে দেয়নি।

তাকে পরাজিত করার প্রয়াস হয়েছে যুগে যুগে।

বিদেশি মুসলমান আক্রমণকারীরা ভারতবর্ষে কেবল ভারতীয় সাভিমানের উপর আঘাত করেছে এমন নয়, হিন্দু সমাজকে অপমান করার জন্য সব রকম চেষ্টা চালিয়েছে। ভগবান শ্রীরামের জন্মস্থান, শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি মথুরা, কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করে। অযোধ্যা এবং শ্রীরামজন্মভূমি এক সময় ভারতের গৌরবময় স্থান ছিল। রাজা সগর, ভগীরথ, হরিশ্চন্দ্র, রাজা দশরথ এখানে রাজত্ব করেছেন। মুসলিম আক্রমণকারী বাবর ভারতের সেই অস্মিতার উপর আঘাত হানে এবং শ্রীরামের জন্মভূমির উপর একটি মসজিদ নির্মাণ করে। যা বাবরি মসজিদ হিসাবে পরিচিত হয়। এই অপমানের প্রতীককে সরিয়ে ভগবান শ্রীরামের মন্দির নির্মাণের জন্য হিন্দুরা সংকল্পবদ্ধ হয়।

সারা ভারতে বা অযোধ্যায় কি কোনো রামমন্দির ছিল না? অযোধ্যায় যদি আমরা ঘুরে দেখি তাহলে দেখতে পাব প্রায় এক হাজার ছোট বড় মন্দির রয়েছে। তার মধ্যে বেশির ভাগই মন্দির শ্রীরামের লীলা ও তার জীবনী প্রসঙ্গে আলাদা আলাদা নামে রামমন্দির। ১৫২৮ সাল থেকে নিরন্তর সংঘর্ষ চলছে রামমন্দিরের জন্য। রামমন্দির তো অযোধ্যায় ছিলই, তাহলে বিবাদের কারণ কী? মন্দির নির্মাণের এই নিরন্তর প্রয়াস কীসের জন্য? অযোধ্যার জনগণ মনে করেন ‘‘জন্মস্থান মন্দির’’ নামে যে স্থান ছিল বাবরের সেনাপতি ১৫২৮ সালে তা ভেঙেছিলো। জনগণ এর বিরোধ করে। লড়াই করে। জনগণ প্রথম থেকে সংগঠিত না থাকার জন্য বাবরের সেনাপতি মন্দির ধ্বংস করে তার ধ্বংসাবশেষ দিয়ে বাবরি মসজিদ নির্মাণ করে। যা ছিল তিন গম্বুজযুক্ত ধাঁচা। যে ছবি আমরা প্রচার মাধ্যমে বর্তমান দেখছি। ঝগড়ার

কারণ হল হিন্দুরা বলেন ওই স্থানটি ভগবানের জন্মস্থান, আমরা তা ফিরে পেতে চাই। অপরদিকে ওখানকার মুসলমানদের দাবি ওখানে কোনো মন্দির ছিল না।

বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়ায়। প্রথমে ফৈজাবাদ আদালত পরে এলাহাবাদ হাইকোর্ট, সর্বশেষ নির্ণয় দেয় সুপ্রিম কোর্ট। ১৬১ বছর ধরে ধৈর্য ও আশা নিয়ে বিচারের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। সুপ্রিমকোর্টে মামলাকারীর পক্ষে ছিল নির্মোহী আখড়া, সুন্নী ওয়াকফ বোর্ড এবং রামলালা বিরাজমান। গত ৯ নভেম্বর ২০১৯ সুপ্রিমকোর্ট রামলালা বিরাজমানের পক্ষে বলেছেন যে মন্দির ওখানেই হবে যেখানে বর্তমানে রামলালার পূজা চলছে। ট্রাস্ট গঠন করে সেখানে মন্দির নির্মাণের কাজ করতে হবে। এখন প্রশ্ন হল ''রামলালা বিরাজমান'' কী? হিন্দু পরম্পরা অনুসারে আমরা যখন কোনো মন্দির নির্মাণ করি তখন বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। অর্থাৎ পাথর বা ধাতুর মুর্তিতে প্রাণ সঞ্চার করা হয়ে থাকে। যখন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় তখন তা পাথর থাকে না। প্রাণ চলে গেলে মানুষ মারা যায়। তখন তাকে মাটির সমান বলে মনে করা হয়। তাই তাড়াতাড়ি আমরা তাকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করি। প্রাণ প্রতিষ্ঠায় মুর্তি জীবন্ত হয়ে যায়। হিন্দু আইনের এই বিষয়টিকে আমাদের বোঝা দরকার। প্রাণ প্রতিষ্ঠিত মুর্তিকে জীবন্ত সত্তা বলে মনে করা হয়। কিন্তু মূর্তি তো কোনো কিছু করতে পারেও না। চলতে পারে না, বলতে পারে না, খেতে পারে না, স্নান করতে পারে না, বস্ত্র বদল করতে পারে না, নিজের সুরক্ষা নিজে করতে পারে না—কিন্তু তবু তা দীপ্ত! যে জীবন্ত তার তো মকদ্দমা করারও অধিকার থাকবে। কিন্তু সে যে নিজে করতে পারে না। যে নিজে কিছু করতে পারে না তার একজন গার্জিয়ান দরকার। যে দেবতা নিজে মামলা দায়ের করতে পারবে না তার হয়ে গার্জিয়ান দ্বারা মামলা করা যায়। ভগবানের গার্জিয়ান কে হবেন তা আদালত ঠিক করে দেন। হিন্দু আইন অনুসারে মুর্তিকে নাবালক হিসাবে ধরা হয়। এখন প্রশ্ন হলো বিবদমান স্থানটি কোনো সামান্য জমি মাত্র নয়, তা ভগবান রামের জন্মস্থান। জন্মস্থান কখনও অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা যায় না, বদল করা যায় না। ওই ভূমিও হিন্দু সমাজের কাছে পূজনীয়।

১৯৮৩ সাল থেকে দেশের সাধু সন্তদের পরামর্শে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এই আন্দোলনে যুক্ত হয়। গোরক্ষ পীঠাধীশ্বর মহন্ত অবৈদ্যনাথজীর (উঃ প্রদেশের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর গুরু) নেতৃত্বে কংগ্রেস নেতা দাউদয়াল খান্নারকে সম্পাদক করে এক সমিতি গঠন করা হয়। তখন থেকে জনজাগরণমূলক কার্যক্রম সারা দেশ জুড়ে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ১৯৮৭ সালে শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণের জন্য শিলান্যাস হয়। বিহারের হরিজন সমাজের এক কার্যকর্তা প্রথম শিলাদান করেন। তার আগে ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে 'রামশিলা' পূজনের অনুষ্ঠান করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তখন জ্যোতি বসু। তিনি ঘোষণা করলেন, ''পশ্চিমবঙ্গ থেকে একটাও ইট অযোধ্যায় যাবে না। চরম উৎপীড়ন সিপিএমের, পুলিশের ভীতি প্রদর্শন, সব কিছু উপেক্ষা করে প্রায় ১ হাজার জায়গায় উৎসাহ সহকারে রামশিলার পূজন হল পশ্চিমবঙ্গে। সমস্ত শিলা একত্রিত করে সুসজ্জিত ট্রাকে করে অযোধ্যা অভিমুখে যাত্রার সময় আসানসোলে পুলিশ বাধা দেয়। হাজার হাজার রামভক্ত পথ অবরোধ করে। শিলাপূজন রাস্তার মধ্যে চলতে থাকে। পরে প্রশাসন বাধ্য হয়ে বিহার অভিমুখে শিলাযাত্রা করায়। রামমন্দির নির্মাণের জন্য দেশজুড়ে যে জনসমর্থন সংগঠিত হয় এককথায় তা ছিল অভূতপূর্ব। স্বাধীনতার পর এত বড় জন আন্দোলন আর হয়নি। তাই সুপ্রিম কোর্টের রায় শোনার জন্য সেদিন কত ব্যাকুল প্রতীক্ষা ছিল সারা দেশ জুড়ে। প্রায় তিন লক্ষ গ্রাম এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর সংগঠিত বিশাল হিন্দু শক্তি বিতর্কিত ধাঁচাকে ভেঙ্গে দেয়। তার আগে ১৯৯০ সালের ৩০শে অক্টোবর অযোধ্যায় করসেবার ডাক দেওয়া হয়। উত্তর প্রদেশ সরকারের পক্ষ থেকে অযোধ্যায় রামভক্তদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। নিরাপত্তার বেষ্টনীতে অযোধ্যাকে ঢেকে দেওয়া হয়। অযোধ্যাগামী সমস্ত ট্রেন-বাস বন্ধ করা হয়। পায়ে হেঁটে উত্তর প্রদেশে প্রবেশও নিষিদ্ধ করা হয়। সারা প্রদেশের সমস্ত স্থানে কলেজগুলি অস্থায়ী জেলখানায় পরিণত হয়। অযোধ্যা ও উত্তর প্রদেশে একটা পাখিও যেন ডুকতে না পারে তার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রান্ত থেকে করসেবকরা যাত্রা শুরু করে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রায় এক হাজার করসেবক অযোধ্যাগামী বিভিন্ন ট্রেনে শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশন থেকে রওনা দেয়। ২ নভেম্বর ১৯৯০ মুলায়ম সিং যাদবের সরকার, নিরস্ত্র রামভক্তদের উপর গুলি চালায়, শতাধিক করসেবক আহত হয় এবং ২৪ জন শহিদ হয়। আহত হন অশোক সিংঘল। কলকাতার কোঠারি ভাতৃদ্বয়, রামকুমার ও শরৎকুমার শহীদ হয়। আসানসোলের অভয়কুমার গুরুতর আহত হয়ে ফৈজাবাদের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। কয়েক মাস পরে সুস্থ হয়ে উঠলেও শরীরে এখনও বুলেটের দাগ মিটে যায় নি। বাঁকুড়া জেলা থেকে ২৬ জন করসেবক ভবানীভূষণ মন্ডল ও মোহন চট্টপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অযোধ্যা রওনা হলে উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন অস্থায়ী জেলে বন্দি করে রাখা হয়। জেলে বন্দি থাকার সময় করসেবক শান্তি চট্টপাধ্যায়ের দাদার পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। একদিকে সংবাদমাধ্যমের ভ্রান্ত প্রচার, করসেবকদের উপর গুলি, পরিবারের চরম উৎকণ্ঠা এবং আকস্মিক মৃত্যু সব মিলিয়ে এক চরম অস্থিরতা তার মধ্যে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের উৎপাত কিন্তু সব কিছুকে উপেক্ষা করে সংঘের স্বয়ংসেবক ও তাঁদের পরিবারবর্গ যেভাবে সঙ্ঘের প্রতি আস্থা এবং মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন তা অনুধাবনযোগ্য।

অযোধ্যা মামলার রায় ঘোষণা হয়েছে। তিন মাসের মধ্যে মন্দির নির্মাণের কাজ প্রশস্ত হবে। মন্দির কেবল সময়ের অপেক্ষায়। প্রতিকুল পরিস্থিতিতে যোগ্য নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস যেমন আমরা রেখেছি, অনুকুল পরিস্থিতিতে নিঃস্বার্থভাবে আমাদের কাজ করতে হবে। সর্বে ভবন্তু সুখিন সর্বেসন্তু নিরাময়াঃ হল হিন্দু তত্ত্বজ্ঞান। তাকে সার্থক করার জন্য আমরা কাজ করে চলেছি। অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণ যেমন হবে তেমনি আগামী দিনে ভারতবর্ষে যেন রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন মর্যাদা পুরুষোত্তম। ভারতের রাষ্ট্রীয় মহাপুরুষ। তাঁর জন্য মন্দির নির্মাণের মাধ্যমে ভারতে যেন বিবিধতার মধ্যে একতার মন্ত্র দৃঢ় ও মজবুত হয়। রামমন্দির নির্মাণ হল বর্তমান রাজধর্ম—রামরাজ্য প্রতিষ্ঠাই হোক আগামী দিনের লক্ষ্য।

(লেখক বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক)

ঊনচল্লিশতম ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন করলেন গড়করি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক এবং অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রী নীতিন গড়করি বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে ৩৯তম ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার (আই আই টি এফ) উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সোম পারকাশ উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহজে ব্যবসা করার সূচকের নিরিখে ভারত ২০১৪ সালে ১৪২তম স্থানে ছিল। সর্বশেষ প্রকাশিত তথ্যে ভারত ৬৩তম স্থানে উঠে এসেছে। এই অনন্য সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এবারের মেলার বিষয় 'সহজে ব্যবসা করা—ইজ অব ডুয়িং বিজনেস'। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শ্রী গড়করি বলেন, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগে দেশ প্রভূত উন্নতি করেছে। দেশের মোট রপ্তানির ২৯ শতাংশ এই ক্ষেত্র থেকেই হয়। সম্প্রতি এই ক্ষেত্রে ১ কোটিরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। মন্ত্রী অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগকে দেশের উন্নয়নের চালিকাশক্তি বলে বর্ণনা করেন।

শিল্পোদ্যোগীদের নতুন নতুন ধারণা প্রয়োগ করে ব্যয় হ্রাস, নকশা ও বাণিজ্যের উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। বিভিন্ন রাজ্য কাঁচামাল ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। মন্ত্রী বলেন, এগুলিকে ব্যবহার করে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের সুযোগ গড়ে তুলতে হবে। আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত গুণমানসম্পন্ন আধুনিক প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিচ্ছে বলে মন্ত্রী জানান। শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী শ্রী সোম পারকাশ তাঁর ভাষণে, ৩৯তম আই আই টি এফ-এর মূল ভাবনা 'ইজ অব ডুয়িং বিজনেস'-এর বিষয়ে বিস্তারিত বলেন। দেশের অর্থনীতিকে ৫ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের সমতুল অর্থনীতিতে পরিণত করা ও ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তিনি উল্লেখ করেন। আন্তর্জাতিক স্তরে 'ব্র্যান্ড ইন্ডিয়া'র প্রচারে এই ধরনের মেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে বলে তিনি উল্লেখ করেন। আইআইটিএফ, ২০১৯-এ একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তকে মন্ত্রী স্বাগত জানান।

এই মেলায় বৃহৎ প্রতিষ্ঠান, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ, অসরকারি সংগঠন, বিভিন্ন শিল্পী, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির উৎপাদিত সামগ্রী ও পরিষেবার নমুনা সম্ভাব্য গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির এবং বিভিন্ন সংস্থার সংস্কারমূলক নানা উদ্যোগের তথ্য, নতুন কর্মসূচি ও উদ্যোগের খবর এই মেলা থেকে পাওয়া যাবে।

অস্ট্রেলিয়া, ইরান, ব্রিটেন, ভিয়েতনাম, বাহরিন, বাংলাদেশ, ভুটান, চীন, মিশর, হংকং ও ইন্দোনেশিয়া-সহ বিভিন্ন দেশ ১৪ দিনের এই বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করেছে। আফগানিস্তান এই মেলায় অংশীদার দেশ ও বিহার এবং ঝাড়খণ্ড 'ফোকাস স্টেট'। আর্থ- সামাজিক ক্ষমতায়ন ও শিল্পের জন্য ভারতের নানা উদ্যোগে এই মেলা বিশেষভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। দেশে শিল্পোদ্যোগের বিভিন্ন উদাহরণ এই মেলা থেকে পাওয়া সম্ভব।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

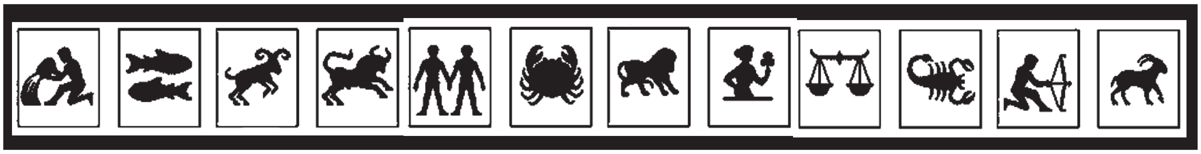

২৫ নভেম্বর (সোমবার) থেকে ১ ডিসেম্বর (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রাহু, তুলায় মঙ্গল, বুধ, বৃশ্চিকে রবি, ধনুতে বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, কেতু। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র তুলায় স্বাতী নক্ষত্র থেকে মকরে উত্তরষাড়া নক্ষত্রে।

মেষ : মেজাজ প্রশমিত রেখে সমাজ প্রগতিমূলক ও পেশাগত কর্মে গতি বিস্তার। ব্যয়বাহুল্য অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতাকে ব্যহত করবে। সন্তানের মতিগতির পরিবর্তনে পড়াশুনায় রুচিহীনতা। স্বজন সম্পর্কে উন্নতি, দূরের কোনো বন্ধুর সহযোগিতা লাভ। প্রেমের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা। সম্পত্তি বিষয়ক আইনি পদক্ষেপ ও দাম্পত্য সম্পর্কে সতর্কতা প্রয়োজন।

বৃষ : পিতার বার্ধক্যজনিত স্বাস্থ্যহানি। সন্তানের কারণে পারিবারিক অস্বস্তি। গৃহে পূজা পাঠ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, জীবন সাথীর জেদের ফলে জটিলতা তবে গুরুজনের পরামর্শ হিতকারী ও সময়োপযোগী। কর্মস্থানে গুরুদায়িত্ব কাউকে দিলে অনুতাপ- অনুশোচনা করতে হবে। অটোমোবাইল, তথ্য প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মে প্রাপ্তি শুভ।

মিথুন : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের ডিপার্টমেন্টাল হেড হওয়ার সম্ভাবনা। স্ত্রী অর্থ ও ভাগ্যোন্নতির সহায়ক-গৃহ ও মাতৃসুখ, পিতার ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি। ভ্রাতা-ভগ্নীর সুখবর, কর্ম সূত্রে দূর গমন। কর্মপ্রার্থীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা। বন্ধুমহলে সখ্য বৃদ্ধি, বিদ্যার্থীর ব্যস্ততা, চিন্তার উৎকর্ষতা ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর মন।

কর্কট : পরিজন প্রিয়, পরাক্রান্ত, ভূমি, গৃহলাভ। শুভ কর্ম, ধন-পুত্র, মিত্র লাভ। বিদ্যার্থীর সাফল্য, নিকট বন্ধু দ্বারা দুরূহ কর্মে সফলতা। কর্মের প্রতিটি পদক্ষেপে গোপনীয়তা বজায় রাখুন। অধস্তনের অসহযোগিতা, বিরূপ মন্তব্যে শান্ত-সংযত ভাবে দায়িত্ব সচেতনতার পরিচয় দিন। মাতার স্বাস্থ্য ও ব্যবসায় মন্দাভাব উদ্বেগের বিষয়।

সিংহ : বহুদিনের সুপ্ত বাসনার বাস্তবায়ন। অশন, বসন, ভোজন, রসনায় তৃপ্তি। গৃহে সাড়ম্বর অনুষ্ঠানে অতিথি সমাগমে আনন্দ। শিল্পী, সাহিত্যিক, কলাকুশলী, বুদ্ধিজীবীর সৃষ্টি ও সৌন্দর্যসুধায় নিপুণতা ও বিদ্যার্থীর উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা। দাম্পত্য সম্পর্কও পারিবারিক অসুস্থতায় অপ্রত্যাশিত ব্যয় ও ক্লেশ।

কন্যা : মিত্র সঙ্গে মান, অভিমান, ভুল বোঝাবুঝি, উদাসীনতায় ভারাক্রান্ত মন। জীবিকার্জনে জটিলতা, প্রতিবেশীর বিরূপতায় রক্ষণশীল ও সমঝোতা শ্রেয়। স্বর্ণ, বস্ত্র, ওষুধ, স্টেশনারি ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগে বিত্ত ও আভিজাত্য বৃদ্ধি। শরীরের নিম্নাঙ্গের চোট- আঘাত ও সংক্রামক রোগে সতর্কতা প্রয়োজন।

তুলা : পরিবহণ, খনিজ ও তরল ব্যবসায় শুভ। পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও জনহিতকর কর্মে ভালো সুহৃদ সম্পর্কে মনিব বেদনার প্রতি অগাধ সহানুভূতি ও সম্মান প্রাপ্তি। সন্তানের চঞ্চল মানসিকতায় পরিবারে শান্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়। বাহন চালকদের সতর্কতা ও ক্রীড়াবিদদের স্বীকৃতি। নারী জাতিকাদের পুরানো প্রেমের পুনরুজ্জীবন ও পূর্ণতা লাভ।

বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলুন। ব্যবসায় নতুন ধারা, সৌহার্দ্যমূলক আচরণ, বহুমুখী প্রতিভায় শত্রুতা প্রশমন। সন্তানের জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তাশক্তির উৎকর্ষতায় পারিবারিক গর্ব ও আনন্দ। সাংসারিক সমৃদ্ধির ত্বরান্বিত গতিতে জীবনসঙ্গীর সদর্থক ভূমিকা। দূর ভ্রমণের পরিকল্পনা স্থগিত রাখা সুখকর।

ধনু : আর্থিক গতানুগতিক অবস্থা, কর্মস্থানে অতিরিক্ত দায়িত্বে মানসিক চাপ, উচ্চাভিলাষী। প্রতিবেশীর ছল-চাতুরি বিষয়ে সতর্ক ও বাক্‌সংযমী হওয়া দরকার। গৃহ-বাহন ও ভ্রমণ যোগ। প্রেমানন্দে পুলকিত মনে পরিণয়ের পথ প্রশস্ত। শিক্ষিত অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের বিভাগীয় পদোন্নতি। সন্তানের চেষ্টায় সাফল্য।

মকর : দোমনাভাব সমালোচনা ও কটু মন্তব্য পরিহার করুন। কারিগরী দক্ষতার বাস্তবায়ন ও স্বাচ্ছন্দ বোধ। বিদ্যার্থী ও সাহিত্যপিপাসুদের প্রতিভার স্ফুরণ, সৃষ্টির আনন্দ, বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা। সপ্তাহের প্রান্তভাগে হঠাৎ প্রাপ্তি ও বান্ধবীর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি।

কুম্ভ : শিষ্টাচার, সৌজন্য, সরলতা, চিন্তার উদারতা, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও স্বজন বাৎসল্যে আনন্দময়তার প্রকাশ। কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা ও প্রভাব তর্কাতীত হলেও কর্তৃপক্ষের ভূমিকা আশাব্যঞ্জক নয়। শারীরিক ক্লান্তি-অবসাদে কথার দাম না থাকার সম্ভাবনা।

মীন : শুভ সময়ের সদ্ব্যবহার করুন। বুদ্ধিমত্তায় কর্মে সাফল্য তবে আয়ের শ্লথ গতি। আকাশকুসুম কল্পনা, প্রতিযোগী মনোভাব, হঠকারিতা পরিহারে দগ্ধ হৃদয়ে শীতলতার প্রলেপ। জীবনসঙ্গীর বৈষয়িক বুদ্ধি পারিবারিক সমৃদ্ধির সহায়ক। গুরুজন স্থানীয়ের অসুস্থতায় উদ্বেগ। রক্তচাপ, হৃদযন্ত্র ও মুখমণ্ডলের চোট-আঘাতে সতর্কতা প্রয়োজন।

● ***জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।***

—শ্রী আচার্য্য